একগুচ্ছ ধারাবাহিক

রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি

উপন্যাস। তাজ্জব মহাভারত

থ্রিলার। মরা মৌমাছির চোখ

বেড়ানো। বউ সাথে পথে পথে

নিয়মিত প্রতিবেদন

কবির কলমে সুভান

উত্তরের উপকথা। রাসায়নিক রস

গল্প। ধ্রুবতারা

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

ডিসেম্বর ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

ডুয়ার্সের চার্চগুলিতে প্রাক বড়দিন সুহানা সফর

দেশ চুরি?

দেশ কি চুরি করা যায়? সেই চুরি হয়ে যাওয়া দেশ কি খুঁজে পাওয়া যায়! অবাক এই অনামী উত্তর কন্যাটির মতই কি হতভাগ্য আমরা সবাই খুঁজে ফিরি নিজের দেশ নিজের মাকে? বছরশেষে এক অমোঘ প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের।

চল গেলাশ ভরি মুবারক হো নয়া সাল

ফারাকটা কিন্তু উনিশ-বিশের নয় কত্তা, আপনারা হয়ত পারফেকশনে ‘বিসোয়াস’ করে থাকেন, তাই বলি, উনিশ আর কুড়ির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। মাস পেরোলেই দেওয়ালে নতুন ক্যালেন্ডার ঘোষণা করবে আরেকটা নতুন বছর এল, অর্থাৎ আরেকটা তিনশ ছেষট্টি দিনের জীবনক্ষয়। আরেকটা ভয়াবহ গ্রীষ্ম, আরেকটা বর্ষাপ্লাবিত মাঠ-ঘাট-রেললাইন, আরেকটা নিরানন্দ শরৎ পেরিয়ে ফের আরেকটা শীতঘুমে যাওয়ার আহ্বান। যে শীতের সংক্ষিপ্ত বিকেলের রোদ আপনাকে স্মৃতিমেদুর করে তোলে, একটা ধূসর রঙের টেনিস বল ছুটতে ছুটতে পাকা রাস্তা পেরিয়ে পাল বংশের পোড়োবাড়ির জঙ্গলে হারিয়ে যায়। অন্ধকার নেমে এলে যখন ত্রস্ত হয়ে ওঠে মন, কিশোরী কন্যাটি বাড়ি ফিরেছে কি না, তখনই তার মৃদু ভর্ৎসনা জোটে, ও কাম অন পাপা, আমি এখন আর টিন এজ নই, নাইনটিন নই, অ্যাম টোয়েন্টি নাও। পূর্ণবয়স্ক। সো... আমার ভালমন্দ আমাকে ভাবতে দাও।

যুগটাই আসলে টোয়েন্টি টোয়েন্টি-র, স্যর। কবে গাছ বড় হবে, সেই ফলের আশায় গোঁফে তেল দিয়ে লাভ নেই। একটি বলকেও ছাড়া যাবে না, ব্যাকফুটে এসে ‘রক্‌শনাত্মক’ জারিজুরি দেখালে চলবে না, প্রতিটা বল চালিয়ে খেলতে হবে। তবেই পাশ হবার চান্স মেলে, সমীহ করে সবাই। না হলে পাঁচ বছরের পথ যে অনেকটা, একটা বাস মিস হলে বুড়ো হয়ে যেতে হয়। একটা পদ, একটা আসন বা একটা টেন্ডার কিংবা একটা লাইসেন্স আজ না পেলে পিছিয়ে পড়তে হয় অনেকটা, কাল কে কোথায় থাকবে তা কে বলতে পারে? অতএব সেই পুরনো আপ্তবাক্য ঘুরেফিরে নতুন অর্থ বয়ে নিয়ে আসে, কাল যা করার তা আজই করে ফেলো বাপু, আজ যা করবার তা এখুনি কর। যেনতেন প্রকারেণ কর। সুদিনের অপেক্ষায় বসে থেকে যদি ভাবো একদিন সবাই তোমাকে রাজা বানিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ে যাবে, তবে হাজার বছরের অনন্ত প্রতীক্ষায় ঘুমিয়ে পড়া ভাল।

বয়স বাড়ল পৃথিবীর, বয়স বাড়ল সাহিত্যের। পাঠক লক্ষ্য করলে দেখবেন, ইদানিং কিঞ্চিৎ সাহিত্যে মনযোগী হয়েছি আমরা। সাংবাদিকতায় আজ বড় লেখক-অভাব। অতএব পিওর সাহিত্যের মানুষদের সাংবাদিকধর্মী প্রতিবেদন এই সংকট থেকে বাঁচাতে পারে। জানুয়ারির ১৮-১৯ তারিখে আয়োজন করা হচ্ছে ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসব। এবারের শীতে এটাই কি বড় খবর, নতুন কোনও বার্তা আনতে পারবে?

শীত এখন আর অনেক কিছুই আনে না, সাহেব! সেই খেলার মাঠ, সেই রাসমেলার সন্ধে, সেই কমলালেবুর বিকেল, সেই বনভোজনের রাত, নিষিদ্ধ পল্লীর সেই বাংলার ঠেক, নীল ছবির ভিডিও হল, বারুদের গন্ধভরা কবিতা, কিচ্ছুটি নয়। শীত আনে অনামী অচেনা ভাইরাস, অকেজো ফুসফুস আর চর্বির বোঝা বয়ে ক্লান্ত কৈশোর ভারি চশমার আড়ালে খুঁজে ফেরে সাথী, বড় একাকী। শীত বয়ে আনে পাতা ঝরানো সোঁ সোঁ বাতাস, এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে বুক।

বৃদ্ধ স্যান্টাক্লজ তবু তার ন্যুব্জ পিঠের ঝুলিতে চাপিয়ে নিয়ে আসছে আরেকটা নতুন বছর, গির্জায় গির্জায় আলোর রোশনাই, ঘণ্টাধ্বনি— আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। তবু নির্ভয়ার মতই আরেকটা কুয়াশা জড়ানো ভোর কাটিয়ে ভেঙে পড়া স্বজনের কাঁধে ফেরে প্রিয়াংকার আধপোড়া লাশ— আরেকবার প্রমাণ করে দিয়ে যায়, বিবর্তনের ইতিহাসে শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছি আমরা— জন্তুযুগে।

কী হবে এসব ছাইপাশ লিখে তবে, প্রভু? কী হবে মোমবাতি জ্বেলে? যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমার কন্যার পেলব কলজেখানি তা আর আমার বুকে আগুন জ্বালতে পারে কই? আমি বরং নিথর জৈব হয়ে অপেক্ষায় থাকি সেই শেষদিনের।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি	
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড	৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির	
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার	৯৫৬৪৯৯৮৫৬১
জলপাইগুড়ি	
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে	৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার	
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)	৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা	
দিলীপ সরকার, চালসা মোড়	৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি	
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল	৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া	
বরুন ঘোষ, পোকিসা	৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট	
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি)	৯৩৮২৯৭৭৬২৯
লাটাগুড়ি	
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)	৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি	
দেবাশিষ বসুভাট	৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা	
অমল চন্দ্র পাল	৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ	
আনন্দবাজার বুক স্টল	৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা	
হরিপদ রায়	৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার	
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট	৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার	
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে	৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা	
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি	৭৮৬৪৯৯৫৫১৫
বালুরঘাট	
মাধববাবু	৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন	৯৮৩০৪১০৮০৮
কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক	
বিশাল বুক সেন্টার	৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা
এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা
পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্তা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ অরুণাভ দাস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন

সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৬

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

কেন পাকিস্তানি গবেষকরা বলছেন গান্ধী মুসলিম মৌলবাদের জনক? ১০

বামভক্ত বুদ্ধিজীবিরা ইতিহাসকে বদলে দিতে চেয়েছেন, শিক্ষাকে বনবাসে ১২

দেশ চুরি? ১৪

ডুয়ার্সের চার্চগুলিতে প্রাক বড়দিন সুহানা সফর ১৮

কবির কলমে

সুভান ১৬

উত্তরের উপকথা

চৈতি ছট ১৭

ধারাবাহিক কাহিনি

বউ সাথে পথে পথে ২১

তাজ্জব মহাভারত ২৩

মরা মৌমাছির চোখ ২৭

গল্প

ধ্রুবতারা৩৪

শ্রীমতি ডুয়ার্স

আমার মেয়েবেলা ৩৬

সুভদ্রা মহাকাব্যের বঞ্চিত নায়িকা ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

ফেসবুক পোস্ট ৪

খুচরো ডুয়ার্স ৫

রাসায়নিক রস ৩৮

সেরা পোস্ট

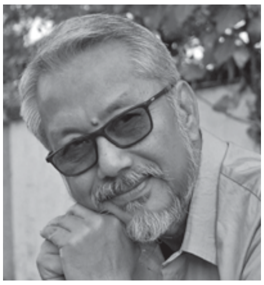

তপন রায় প্রধান
৬ নভেম্বর ২০১৯

গবেষণায় তথ্যচিত্রে আব্বাসউদ্দীন কোনোদিন ভাবতেও পারিনি, আমার প্রথম বই "আব্বাসউদ্দীন" প্রায় দু'দশকে পৌঁছেও, আমায় এতটা আনন্দ দেবে! (দীপ প্রকাশন। প্রথম সংস্করণ ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩)। যেমন সেদিন ভাবতে পারিনি, বইটি প্রকাশের পরপরই বিবিসি রেডিওর বাংলা সার্ভিস, আমার লাইভ অন-লাইন ইন্টার্ভিউ নেবে! প্রসঙ্গক্রমে বইটিতে লিখেছিলাম, "শিল্পী ও সংস্কারক আব্বাসউদ্দীন আহমদকে নিয়ে একটি প্রথাগত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার অবকাশ আছে... কেউ যদি এই বিষয়ে উৎসাহী হন; অনেক অনালোকিত দিক উদ্ঘাটিত হতে পারে"।

সুখের খবর, সেই উৎসাহ দেখিয়েছেন গবেষক নাসরিনতুইসলাম। জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। এখন আমেরিকারও। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার কাজটি করছেন। নাসরিন একজন তথ্যচিত্র নির্মাতাও। তাঁর একটি অসাধারণ কাজও দেখলাম। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়, একইদিনে, একযোগে বিভিন্ন দেশ থেকে" স্বঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার" যে আটটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে; তার নেপথ্য ইতিহাস।

পিএইচডি"র পাশাপাশি আব্বাসউদ্দীনকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ- তাঁর পরিকল্পনায়। আগেই ফোনে বলে রেখেছিলেন। সেইমতো আজ এসেছিলেন শিলিগুড়িতে; আমার একটি দীর্ঘ ইন্টার্ভিউ রেকর্ড করতে। কিছুটা তাঁর গবেষণার জন্য। কিছু অংশ তথ্যচিত্রের। একবেলার অতিথি হয়ে ফিরে গেলেন। নাসরিনের জন্য অনেক ভালোবাসা, শুভকামনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, সশ্রদ্ধ-কৃতজ্ঞতা জানাই আব্বাসপুত্র, স্বনামধন্য স্যার মুস্তাফাত্তজামানত্তআব্বাসিকে। কোথাও বইটি পাচ্ছিলেন না নাসরিন। প্রকাশকের স্টকে বহুদিন হল নেই। আব্বাসী সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বইটি জেরক্স করে নেওয়ার অনুমতি দেন।

ভাস্কর চক্রবর্তী
১০ নভেম্বর

১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় একটি পরিত্যক্ত মসজিদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়াটা যে এদেশের আইন-শৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থার ওপর সরাসরি আঘাত হানা ছিল সেকথা সুপ্রিম কোর্টের গতকালের রায়ে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে।

ফৈজাবাদ জেলা আদালতের রায়ে ওই বিতর্কিত জমিটিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অনেক আগে থেকেই মসজিদটি "ডিসেক্রেটেড" বলে ঘোষিত হওয়াতে ওখানে নমাজ আদা করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেজন্যই মসজিদটিকে পরিত্যক্ত বলায় কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

অতএব, মসজিদ বা মন্দির নয়, বরং ওই জমিটির মালিকানা কাদের, আদালতের কাছে সেটাই বিচার্য ছিল।

সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড সংশয়াতীতভাবে সেই প্রমাণ দিতে পারেনি।

অতএব, ওই জমি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যসরকারে ন্যস্ত হয়েছে।

যে কোনও বিবাদাস্পদ জমির ক্ষেত্রে কোনও একপক্ষেরও দাবি নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত না হলে আদালতের সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ অমনটাই হয়ে থাকে।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, সেই জমিতে রামমন্দিরই হবে কেন?

সুপ্রিম কোর্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের মর্যাদার কথা বলছে। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী ওই জমিতে রামের জন্মের কোনও বস্তুগত প্রমাণ না থাকলেও ধরে নেওয়া হল ওটাই রামের জন্মভূমি।

অতএব, ওখানে রামমন্দিরই হবে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আরও যে প্রমাণটির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা হল পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি রিপোর্ট।

যাতে বলা হয়েছে, ওই জায়গায় মাটির নিচে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা গঠনগতভাবে অমুসলিম। তাই ওখানে কোনও প্রাচীন মসজিদ থাকবার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু, কীভাবে নিঃসংশয় হওয়া গেল যে ওখানে রামের মন্দির ছিল, সেই প্রশ্নেরও উত্তর মেলে না।

পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ ওখানে ঠিক কী ছিল সেই অনুসন্ধানটি সম্পূর্ণ না করাটাও এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

সুপ্রিম কোর্টই বা কেন সেই অনুসন্ধানকে একটা নির্দিষ্ট সত্যে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দিল না, সেটাও এক রহস্য।

এ থেকে বোঝা যায়, ওই জায়গায় কোনও এক অমুসলিম নির্মাণকাজ ধ্বংস করে তার ওপর একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল যে সেই প্রমাণ পেয়েই সুপ্রিম কোর্ট সন্তুষ্ট হয়েছে।

তাতে করে ওই জমির ওপর মুসলিম সম্প্রদায়ের এক অংশের দাবি খারিজ করে দেওয়াটা সহজ হয়। কারণ, শিয়া সম্প্রদায় অনেক আগেই ওই জমির ওপর তাদের দাবি ছেড়ে দিয়েছিল।

কাল ওই রায় বেরোবার পর সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডও তাদের দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাই এ নিয়ে আর কোনও বিতর্ক অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

সমস্যাটা এবার অন্য জায়গায়।

প্রথমতঃ, এরপর একে একে কাশী, মথুরা, তাজমহল, লালকিলা ইত্যাদি জায়গা নিয়ে সম্ভাব্য বিতর্কের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় প্রিসিডেন্স হিসেবে ব্যবহারের দাবিটা নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে কি? সেক্ষেত্রে এই রায় কি "সংখ্যাগুরু'র" বিশ্বাস'কে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করলো না?

দ্বিতীয়তঃ, 'বিশ্বাস'কে মর্যাদা দিতে হলে শবরীমালা মন্দিরে ঋতুমতী নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায় পুনর্বিবেচনার মামলাটি সম্পর্কে একটা আগাম ধারণা করে নিতে অসুবিধে হয় না।

অর্থাৎ বিশ্বাস ও জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের প্রশ্নটি এখন মুখোমুখি সঙ্ঘাতে পড়ে গেল। সেখানে বিশ্বাসে আস্থা রাখতে হলে ডিসক্রিমিনেশনকে মেনে নিতে হয়।

সেই একই যুক্তি মুম্বাইয়ের হাজী আলির দরগায় মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

এই যুক্তিজাল এই জন্যই সাজাচ্ছি যে, এই গোলযোগে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংজ্ঞাটি ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে না! এহ বাহ্য যে, সেকিউলারিজমে বিজেপির ঘোরতর আপত্তি। অযোধ্যায় রামমন্দির বানাতে পেরে তারা যে যারপরনাই উৎফুল্ল হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

এসব দিয়ে আর কিছু না হোক, অর্থনৈতিক মন্দা, কর্মহীনতা, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যুর মত জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে তো শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত করে লুকিয়ে ফেলা যাবে।

বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরি না করতে পারলেও কুছ পরোয়া নেহি।

মন্দির ত বনায়া!

আসাদুদ্দিন ওয়াইসিরাও খুশি। মুসলিম আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তাঁর রাজনীতির পালেও বাতাস দেবে।

কথাটা বলব এই জন্যই যে, কাশ্মীরে জঙ্গী হামলায় নিহত পাঁচজন অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যুতে তিনি ওই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস নিয়ে মুখর হননি। অথচ সাত তাড়াতাড়ি বাবরি মসজিদের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করবার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন!

চিলিতে যে সরকারবিরোধী উত্তাল গণবিক্ষোভ চলছে সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, ওখানকার সমস্যাগুলো তো হুবহু আমাদের দেশের মতই। বরং ভারতে সমস্যার তীব্রতা সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে আরও অনেক তীব্র। তবু কেন এখানে চিলির মত গণবিক্ষোভ তৈরি হচ্ছে না!

উত্তরটা পেয়ে গেলাম কালকের রায়ে।

আগেও লিখেছি, আবারও মনে করাই।

বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল যে সময়ে ঠিক সেই একই সময়ে সংসদে 'গ্যাট' চুক্তিতে এদেশের অংশীদারিত্বের প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায় একরকম কোনও আলোচনা ছাড়াই। সংসদে সে সময় সরকারের খুব একটা সংখ্যাধিক্যও ছিল না।

অর্থাৎ প্রয়াত রাজীব গান্ধীর মুসলিম মহিলা বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী খরপোষ বাতিল আইন এবং আজকের তিনতালাককে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করবার মত আইন স্রেফ সংখ্যাধিক্যের জোরেই পাস করিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না সেদিন।

তাছাড়াও সংসদের ভেতরে না হলেও রাস্তায় নেমে ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তৈরির সুযোগ ছিল।

কিন্তু, তা হয়নি।

সারাদেশ তখন উত্তাল বাবরি মসজিদ ভাঙা পরবর্তী দাঙ্গা নিয়ে।

'গ্যাট' চুক্তির ভালমন্দ নিয়ে কোনও আলোচনার সুযোগই রাখা হয়নি সেদিন।

আজও ঠিক ওই একই কারণে একদিকে রামমন্দিরের পর এবার কাশী, মথুরা, তাজমহল, লালকিলা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি এবং অন্যদিকে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস!

কলিকা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পদ্মমুখী হইয়াছিলেন, সম্প্রতি ভোটবল প্রতিযোগিতায় তিন গোল খাইয়া তাঁহারা মোহ্যমান। বিপরীতে তৃণমুখীদের আহ্লাদের সীমা নাই। হাসি হাসি মুখে তাঁহারা গতকাল যাহাকে ভিন্ন গোষ্ঠির বলিয়া গালি দিতেছিলেন তাঁহার হাত ধরিয়া মিছিলে হাঁটিতেছেন। ডুয়ার্স জুড়িয়া এইরূপ গোষ্ঠিসন্ধির অনেক আলোকচিত্র ইতিউতি দেখা যাইতেছে। বিপরীতে পদ্মমুখীরা কোমর বাঁধিয়া গোষ্ঠিফাইট করিবে বলিয়া রেডি হইতেছে। এইসব প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিলাম কয়েক দিন সমিতির দিকে পা বাড়াইব না। পরে শীত ভাল মত পড়িলে সব ঠান্ডা হইয়া গেলে আবার আসিব। তখনই কে জানি কহিল, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ-এর প্রচার জঙ্গলে ভাল মত করা হয় নাই। শুনিয়া কহিলাম, ইহার মানে? সে তখন একখানি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাহিনী শুনাইল। উহা নিম্নে ছাপিলাম ।

রাইনোবাস

সেই দিন কাকভোরে চালসার কাছে পানঝোরা জঙ্গল হইতে এক গন্ডার যোগাসনের ক্লাশে যাইতেছিল। তখন এক অজ্ঞাত পরিচয় বাস তাহাকে ধাক্কা দিয়া ভ্যানিশ হইয়া যায়। ধাক্কা খাইয়া গন্ডারের লস অফ মেমারি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ফলে রাস্তা ভুলিয়া সে হাজির হয় চালসা রেল স্টেশানে। কিন্তু রেলগাড়ি দেখিবার পর তাহার মনে হইয়াছিল যে প্রতিশোধাত্মক গুঁতো মারিবার পক্ষে ট্রেন অতিরিক্ত ভারি বটে! তখন সড়কে নামিয়া একখানি ছোট গাড়ি বাছিয়া গুঁতোনকর্ম শুরু করে। কিন্তু ইহার পরেও তাহার মেমারি কার্ড রিডেবেল্ হয় নাই। নিজের বাড়ি ভাবিয়া জনৈক গেরস্তের বাড়িতে ঢুকিয়া পরে এবং গেরস্তরা প্রবল দক্ষতার সহিত ছাদে উঠিয়া গুঁতো বাঁচায়।
এই দিকে গন্ডারের অ্যালঝাইমার্সের কথা বনকর্তাদের কানে পৌঁছাইতেই তাঁহারা লোক-লশকর লইয়া গন্ডারকে চ্যালেঞ্জ জানাইল। কিন্তু বেচারা গন্ডার স্মৃতিভ্রংশের কারণেই বোধকরি বিট অফিসারকে গাড়ি ভাবিয়া করিল আক্রমণ। অফিসার বুঝিলেন গন্ডারকে জিও দেখাইয়া

লাভ নাই। তিনি ১০০ মিটার স্প্রিন্ট টানিয়া পা হড়কাইলেন। ইহার পর গন্ডারের বোধহয় স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সে চলিয়া গেল জঙ্গলে। এখন সে ভালই আছে।
এখন কর্তব্য হইল গন্ডারদের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বুঝান।

মাতাহাট

গোমাতার হাটকে সংক্ষেপ করিয়া মাতাহাট বলিব। মেখলিগঞ্জে এইরূপ হাট হপ্তায় দুইবার বসে। হাটের নিয়ম মানুষ মানিলেও গোমাতারা কবে মানিয়াছে? রাজনৈতিক সমর্থনের কারণে ইদানিং নাকি আরো মানিতেছে না। বর্তমানে মাতাহাট যেথায় বসিতেছে তাহা আবার যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ পথ। ফলে পাব্লিক পড়িয়াছে আতান্তরে। গোস্পর্শ না করিয়া হাঁটা অসম্ভব হইতেছে। অনেকেই সে পথ অতিক্রম করিয়া দেখিতেছে ফ্রি হিসাবে জুতোয় কি টায়ারে গো-পটি। ফ্রি-তে গোমূত্রও পাইতেছে। বুঝাই যাইতেছে যে হাট এবং হাঁটার সহাবস্থান অসম্ভব। ইহার পর মেখলিগঞ্জবাসী মাতাহাট সরাইতে সোচ্চার হইবে তাহা বলাই বাহুল্য— কিন্তু প্রশ্ন হইল, গোমাতার ল্যাজে টান মারিবে কে?

দেনাচুল্লি

না। ইহা কোনও তামিল শব্দ নহে। ফুলবাড়ি শ্মশানের ই-চুল্লি খাতে বৈদ্যুতিক বিল বাবদ লাখ লাখ টাকার দেনা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য বিদ্যুৎবাবুরা সাপ্লাই বন্ধ করেন নাই। হাসপাতাল হইতে রোগি রেফার করার নিয়ম থাকিলেও শ্মশান হইতে বডি রেফারের নিয়ম নাই। তাই ধার হইলেও দাহকর্ম চলিতেছে। হিসাব কষিয়া জানা গিয়াছে মাসে গড়ে লাখ টাকার বিদ্যুৎ লাগিতেছে আর ভস্ম হইতেছে গড়ে আশিটা। তাহা হইলে অঙ্ক কষিয়া বুঝা যাইতেছে একটি বডিকে পঞ্চভূতে বিলীন করিতে খরচ কমবেশি হাজার টাকা। কিন্তু পঞ্চায়েত নাকি বলিয়াছে 'লস' হইতেছে বলিয়াই ধার। তাহা কেমনে হয়। মহাদিদি তো বলিয়াছিলেন যে পটল তুলিলে সৎকার দক্ষিণা বাবদ হাজার দুয়েক দিচ্ছেন— তাহা হইলে? যাহা হউক। মন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন, চুল্লি ভবিষ্যতে সোলারে চলিবে। তখন লস কমিয়া যাইবে।

সেতুবন্ধন

হৈ হৈ করিয়া বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানীর করলা নদীর উপর একখানি জরুরি সেতু ভাঙিবার কালে পুরসভা যতটা খেপিয়াছিল, গড়িবার কালে ততটাই শান্ত। ভাবখানি এই যে সেতু নাই তো কী হইয়াছে? এই

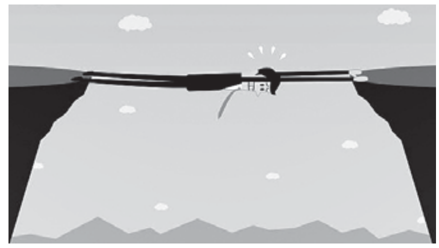

দিকে যে রাজধানীর মূল অংশের দুই পাড়ের জনতা মহা সমস্যায় পড়িয়াছে তাহা লইয়া কোনও মাথা ব্যথা নাই। ফলে দিনবাজারের পুরাতন সেতুর উপর ভারের পরিমাণ বিপুল হইতেছে, তাহাও গুরুত্বপূর্ণ নহে। অমন একখানা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নাতিদীর্ঘ সেতু যদি হাউমাউ করিয়া ভাঙিবার পর ছয় মাসে গড়িতে না পারো তবে পঞ্চায়েত হইয়া যাও! খামোকা কর্পোরেশনের খোয়াব দেখাইতেছ কেন? অত্ত বড় তিস্তা সেতু একখানা দেখতে দেখতে শেষের পথে আর পঞ্চাশ মিটার করলা এক বছরেরও হচ্ছে না— এই চিত্রনাট্য বৈকুণ্ঠপুর রাজধানীর পাব্লিক খাইতে রাজি নহে। অবিলম্বে সেতুবন্ধন করহঃ!
পুররাজ শুনিয়াছেন কি না জানা নাই কিন্তু রাজধানীতে এইরূপ শুনিলাম সেইদিন মহাতামাক কিনিতে গিয়া। যাহা হউক। পুরন্দর ভাট মহাশয়কে রিকোয়েস্ট করিয়াছিলাম পদ্যে 'টুক্রাণু' লিখিয়া দিবার জন্য। পদ্যগুলি তিনি পাঠাইয়াছেন।

টুক্রাণু

১) ভাবি কচুগাছে ঝুলি গলে দিয়া দড়ি/ ডুয়ার্সে হৈল প্যাঁজ দেড় টাকা ভরি।

২) দার্জিলিং-এ কমলালেবু ফলিয়াছে কম/ দাম হবে এত বেশি ফেটে যাবে দম।

৩) কোচদেশে ডেঙ্গু রোগি পাঁচশত হবে/ কার ঘাড়ে ক'টা মাথা স্বীকার করি লবে?

৪) রায়গঞ্জে হসপিটালে দালালে দালালে/ জোর ঘুঁসোঘুঁসি শেষে পুলিশে থামালে।

৫) শিলিগুড়ি পুলিশে 'টিন' নাহি পায়/ একশত টোটো ভাঙে লাঠির গুঁতায়।

৬) গাজলডোবার যেই ভোরের আলো/ তাকে নাকি আদালতে বলিয়াছে ভাল।

(পুঃ সম্পাদক বলিয়াছেন জানুয়ারিতে লিটারারি ফেস্ট হইবে। ভাবিতেছি পুরন্দরবাবুকে আসিতে বলি)

উপসংহার

না লিখিলেও পাঠক নিশ্চই বুঝিয়াছেন ডুয়ার্সে হাতিবাহিনীর দাদাগিরি থামিবার বস্তু নহে। অতি সম্প্রতি তাহারা লাটাগুড়িতে একখানি গাড়িতে লাথি মারিয়াছে, শামুকতলা নামক স্থানে চেঙ্গিস খানের স্টাইলে হানা দিতেছে, এক গণ্ডা গ্রামে কৃষকের খেত সাফ করিয়াছে। অন্যদিকে একজন বেঘোরে মরিয়াছে, একজন আহত হইয়া পালাইয়াছে, একজন নিজের মাহুতকে ট্রেনিং দিবার চেষ্টা করিয়াছে, একজন একা একা ঘুরিয়া বনদপ্তরের ঘুম কাড়িয়াছে, একজন ঠিক কী করিয়াছে মনে পড়িতেছে না। এইগুলি হাতিদের নিত্যকর্ম। না লিখিলেও সবাই বুঝে এগুলি হইয়াছে। হইবে। হইত না।

কলম সিং

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। দ্বিতীয় অধ্যায়। ২য় ভাগ

সার্জন রেনী'র 'ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি'

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

উমেশ শর্মা

সিগঙ, লেলা গিরিপথ, লুং চু, ডোংগা চু ঃ আগের ক্যাম্পগুলিতে যেমন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছিল, তেমনই ব্যবস্থার জন্য সামান্য মালপত্র নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল এবং মিশনটি ২রা ফেব্রুয়ারিতে সিগঙ-এ গিয়ে পৌঁছল।

সিগঙ ৫,৭৫৬ ফুট উচ্চতায় এক মনোরম প্রান্তর। এটি লেলা গিরিপথের একদম নিচে। এখানে পৌঁছানোর জন্য দুটি পর্বতের গা ঘেঁষে ক্রমাগত উপরে উঠতে হয়েছিল। এখানে যে হিংস্র প্রাণীরা থাকে, তার বহু নিদর্শন পাওয়া গেল।

ওই স্থানে আবার কুলিদের পালিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছিল। স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে বরফ ঢাকা গিরিপথ সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছিল। সে সব ঘটনা অবশ্য কোনওটাই অতিরঞ্জিত ছিল না।

৩রা ফেব্রুয়ারিতে সকালবেলা মিশন লেলা গিরিপথে হাজির হয়ে তা টের পেয়েছিল। এক ফুট, দেড় ফুট বরফে ঢাকা পথে যেতে হয়েছিল। লুং চু নামক স্থানে রাত কাটাতে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকে কোনওক্রমে বাঁচতে হয়েছিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় দলটি লেলা গিরিপথ অতিক্রম করে বহু কষ্টে আড়াই হাজার ফুট নিচে নেমে ডোংগাছুচো নামে একটা জায়গায় হাজির হয়েছিল। সেখানে বরফ বেশি পুরু ছিল না বটে, কিন্তু ওই পথ অতিক্রম করতে লোকেরা হতাশ ও বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েছিল। সামনে আবার বরফের উপর দিয়ে চলবার ভয়ে আরও কিছু কুলি জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন মি. ইডেন সবাইকে একদিনের বিশ্রাম দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মাত্র কয়েক মাইল পেরিয়ে উপত্যকটাটির মাঝামাঝিতে আম মোচু (৩,৮৪৯ ফুট) নদীর তীরে তাঁবু খাটানো হয়েছিল। স্থানটিতে সূর্যের তেজ ছিল প্রখর এবং কুলিদের কর্মোদ্যমও বেড়ে গিয়েছিল।

মি. ইডেনের বর্ণনায় মোছু নদী অপরূপা— 'মোছু ছোট্ট এক সুন্দরী নদী। এ নদী যেমন গভীর, তেমনই চওড়া ও দ্রুতগামিনী। এর গর্ভে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড। পাথরের গায়ে জলের ঘর্ষণে অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে সাদা ফেনা। নদীর পার দু'টি এক অত্যাশ্চর্য কারিগরি দক্ষতায় সেতু দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। সমুন্নত পাহাড়ের গা থেকে আড়াআড়িভাবে নদীর এক পার থেকে আট-দশটা বড় বড় কড়িকাঠ ফেলে সেগুলো বড় বড় পাথরের ও মাটির স্তূপ দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে। ওই কড়িকাঠগুলোর উপরে সারিবদ্ধভাবে মোটা ও শক্ত তক্তা স্থাপন করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ওই বিছিয়ে দেওয়া কাঠগুলোর উপর আবার কয়েকটা কড়িকাঠ ফেলে বিপরীত প্রান্তের শেষে অনুরূপভাবে বড় পাথর ও মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। এবার সেই বিমের উপর আবার মোটা তক্তা ফেলে নদীর অপর পার পর্যন্ত পাটাতন তৈরি করা হয়েছে। এভাবে দেশিয় পদ্ধতিতে বীম ও তক্তা ফেলে দু'পারের পাহাড়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বিপরীত দিকে নদীর বিস্তৃতি বেশি হওয়ায় একইভাবে বীম ও তক্তার ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ প্রান্তটুকু বেত ও লতার রজ্জু দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। নদী জল থেকে উপরের স্থিতি ৩০ ফুট এবং বিস্তৃতি ৯০ ফুট মত।

মোছু নদীর উৎপত্তি তিব্বতের ফাগরি থেকে এবং সিকিমের রাজার রাজধানী চুম্বির খুব কাছাকাছি জলাভূমি দিয়ে ভুটানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এসে মিশেছে। ভুটান ভুটানবাসীর সুবিধার্থেই এ সেতু নির্মাণ করেছে। কারণ, বরফ সমাচ্ছন্ন গিরিপথগুলিকে এড়িয়ে এই সেতু ভুটান ও তিব্বতের সঙ্গে সমতলবাসীর যোগাযোগ গড়ে দিয়েছে।'

সাঙবে ঃ ৬ ফেব্রুয়ারি যাত্রারম্ভ করে, কয়েক মাইল খাড়া পাহাড় পেরিয়ে মিশন এক অরণ্যঘেরা জলাভূমিতে এসেছিল। ওই পথ ধরে মাইল আষ্টেক এগিয়ে নিচে নেমে একটি পাহাড়ি ঝরনার তীরে হাজির হলেন সবাই। সেটি পেরিয়ে আবার উপরে ৬,১৪৩ ফুট উচ্চতায় সাঙবে নামক জনপদে এসেছিল মিশনটি। সাঙবে চার-পাঁচটি পরিবারের পল্লী। আশপাশে দু'একটি ছোট বসতি ও কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। গাঁয়ের অধিবাসীরা খুবই সেবাপরায়ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন। ওঁরা ডিম, দুধ, মুরগি প্রভৃতি নিয়ে ক্যাম্পের চারপাশে হাজির হয়েছিলেন। ওঁরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসতে খুবই আগ্রহী। গাঁ লাগোয়া জমিতে ভাল ফসল ফলে। জমিগুলি পাথুরে আল দিয়ে ঘেরা। লাঙল দিয়ে চাষ করা হয়। দার্জিলিং-এর মত হাত দিয়ে চাষ করা হয় না। বার্লি, মারুয়া, জোয়ার, শালগম প্রভৃতি চাষ করেন। আম মাছু নদী থেকে ৮ মাইল দূরে সাঙবে স্থানে সেদিনকার মত বিশ্রাম।

সাঙবের জুঙপেন ৭ ফেব্রুয়ারিতে মি. ইডেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, মিশন সম্পর্কে সরকারি কোনও নির্দেশ আসেনি। ফলে, তিনি নিজেও যেমন মিশনকে সহযোগিতা করতে পারবেন না, তেমনই গ্রামবাসীদেরকেও

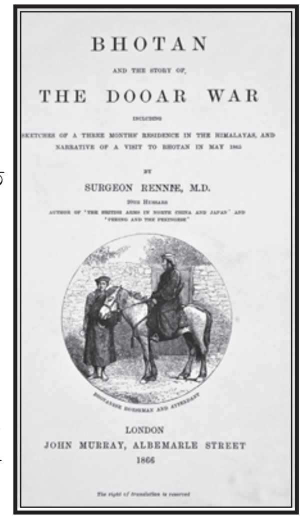

সহযোগিতা করতে বলতে পারবেন না। বিনা অনুমতিতে এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত ঐতিহ্য বিরুদ্ধ নয়। তাছাড়া বাধা দেবার মত পর্যাপ্ত লোকবলও তার নেই। মি. ইডেন যদি এগিয়ে যেতে চান, তবে যেতে পারেন। কিন্তু, তাদের গ্রাম থেকে কোনও কুলি দেওয়া সম্ভব হবে না।

'আচ্ছা, দেবরাজা যে মিশনকে আসতে নিষেধ করেছেন, এমন কথার দায়িত্ব কি আপনি গ্রহণ করতে রাজী আছেন?'— ইডেনের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, ভুটানের কোনও আধিকারিকই এ মর্মে কোনও নির্দেশ দেননি। তবে, তাঁর ধারণা, মি. ইডেন যদি এগিয়ে যান, তবে ভুটানরাজ তাঁদেরকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করবেন না। তবে, তাঁর মতে, সাঙবেতে কিছুদিন অপেক্ষা করাই ভাল। তিনি ওই অবসরে দেবরাজার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

মি. ইডেন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ভুটানের দেবরাজা তাঁর আধিকারিকদের নির্দেশ দেবার অনেক সময় পাবেন, কিন্তু তিনি যে এগিয়েই যাবেন, সে কথা যেন জুঙপেন তাঁকে জানিয়ে দেন। আর যদি দেবরাজা অভ্যর্থনা করার ভান না করে তাঁকে ভুটানে যেতে নিষেধ করেন, তবে তিনি (ইডেন) স্বভূমিতে ফিরে যাবেন।

ওই স্থানে কুলিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে, লেলা গিরিপথে বরফের কামড়ে সব নেপালি কুলিই কমবেশি ক্ষতযুক্ত হয়েছে। সব কুলিকেই পশুচর্ম ও পশমি কাপড় ও পায়ে বুট পরতে বাধ্য করেছিলেন মি. ইডেন।

সিপছুতে ক্যাম্পের লটবহরের বড় অংশ দেওয়ায় বাস্তব অসুবিধা দেখা দিলে মি. ইডেন সঙ্গী মি. পাওয়ারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দার্জিলিং-এ ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাবার সময়ে তিনি যেন অতিরিক্ত মালপত্র ফেরত নিয়ে যান এবং ডালিমকোট দুর্গে যে শিখ সেনা ও নির্মাণকর্মীদের রেখে আসা হয়েছিল, তাদের কয়েকজনকে জুঙপেনের অধীনে রেখে বাকিদের সঙ্গে নিয়ে ফেরেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, সিপছুতে যে চাল মজুত আছে এবং ভুটানের দরবারে উপহার দেবার সামগ্রী সঞ্চিত আছে, ওই সব সিপছুর নেইবুর জিম্মায় যেন রেখে দেওয়া হয়। ইডেন সাহেব সাঙবের জুঙপেন এবং সিপছুর নেইবুকে অনুরোধ করবেন, যারা ফিরে যাচ্ছেন তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেন তাঁরা গ্রহণ করেন এবং দার্জিলিং-এর সঙ্গে ডাক হরকরা নিযুক্ত করেন।

মজার ঘটনা ঃ সাঙবেতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার

বর্ণনা করেছিলেন মি. ইডেন।

সাঙবে যাবার পথে মিশনটি একটি ময়দা কলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নদীর জলে টারবাইন ঘুরিয়ে কলটি চালানো হচ্ছিল। ওই মিলের দায়িত্বে থাকা বুড়ো মিল মালিকটির ঠোঁটে ছিল মস্ত বড় একটি টিউমার। টিউমারটি এতই বড় ছিল যে, সেটি গোটা মুখটিকে ঢেকে মুখের অধর অংশে ঝুলে পড়েছিল। এতে লোকটির খাবার খেতে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছিল। ডা. সিম্পসন লোকটিকে জানালেন যে, সেদিন যেখানে তাদের তাঁবু টাঙানো হবে, ওই স্থানে যদি তিনি হাজির হন, তাহলে তিনি টিউমারটি কেটে বাদ দিতে পারেন। সাঙবেতে সেদিনের যাত্রা বিরতি হলে মিল মালিকটি তাঁবুতে এসেছিলেন ও ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে সাহেব ডাক্তার বহু লোকের চোখের সামনে ওই টিউমারটি কেটে বাদ দিয়েছিলেন। ওই শল্যচিকিৎকের সাফল্য ও সুনাম দ্রুত গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মি. ইডেন ওই ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'শল্য চিকিৎসার সাফল্য ভুটানের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আমরা যখনই কোনও গ্রাম বা জনপদের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং এমনকি আমরা যখন ভুটানের রাজদরবারে হাজির হয়েছিলাম, সবার আগে সকলেরই একটাই প্রশ্ন, 'কোন ডাক্তারবাবু ওই আবটি কেটেছিলেন?'

সেবি ঃ ৯ ফেব্রুয়ারিতে মিশন সাঙবে ছেড়ে এগিয়ে যেতে ওই নামে একটি দুর্গ দেখতে পেল। দুর্গটি টুকরো টুকরো পাথরে তৈরি একটি দালান এবং সেটির ছাদ কাঠের। অবস্থানগত কারণেই সেটির সৌন্দর্য বেশ নয়নাভিরাম। আরও কয়েক এগিয়ে খাড়া ঢালু পথে সুখ-ছু নামে পাহাড়ি একটি ছোট্ট নদীর তীরে প্রতিনিধিদল এসে পৌঁছেছিলেন। ওই নদীর কাঠের সেতুটি বেশ মজবুত। নদী অতিক্রম করে উঁচু উপত্যকায় বহু খরচ করে তৈরি করা একটি আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন সবাই। ওই পথে ছিল অপূর্ব সুন্দর এক জলপ্রপাত। খাড়া পাহাড়ের উপরে উঠে দেখা গিয়েছিল একটি গ্রাম। গ্রামবাসীরা ওই দলকে তাদের দেশের ভেতর দিয়ে যাবার সময়ে সাদরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তারা পথের ধারে শুকনো কাঠ জোগার করে আগুন জ্বালিয়ে একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য ওদের ধারণা হয়েছিল, ইংরেজরা দলবল নিয়ে তাদের দেশ দখল করতে এসেছে। তাই ওরা কোনও রাখঢাক না করে ভুটান সরকারের তীব্র সমালোচনা করছিলেন।

মিশনের সেদিনের রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়েছিল সয়বি (সেবি)-তে। সয়বি সুন্দর একটি গ্রাম। সেখানকার বাড়িঘর খুবই সুন্দর। চাষবাস হয় সামান্যই। স্থানটির উচ্চতা ৬,১৪১ ফুট এবং সাঙবে থেকে দূরত্ব দশ মাইলের মত।

সেখানে পৌঁছে মি. ইডেন জানতে পেরেছিলেন যে, ভুটান সরকারের কয়েকজন জিনক্যাফ (সংবাদবাহক) কয়েকদিন আগেই ওই জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন। তারা এসে একথা প্রচার করেছিলেন যে, প্রতিনিধিদলকে ফেরৎ পাঠানোর দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ওরা নাকি সরকারি হুকুমনামা সঙ্গে করে এনেছেন।

মি. ইডেন ওই জিনক্যাফদের দেখা করতে লোক পাঠান। কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে ওঁরা কিন্তু আসেননি। তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ভয় দেখালে, তারা এসে দেখা করেন। মি. ইডেন ওই সাক্ষাৎকারটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

'একথা প্রকাশ হয়ে গেল যে, আমাকে দেবার মত কোনও পত্রই তাদের হাতে ছিল না। ওরা বলেছিলেন যে, তাদের কাছে যে চিঠি ছিল, তা ডালিমকোটের জুঙপেনের উদ্দেশে লেখা ছিল। উনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, উনি যেন আমাকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আমি যদি এগিয়ে যাই, তাহলে আমাকে বাধার সম্মুখিন হতে হবে।'

মি. ইডেন সংবাদবাহকের কথায় তোয়াক্কা না করে জানিয়েছিলেন যে, একমাত্র দেবরাজার নিষেধসূচক চিঠি পেলেই তিনি ফিরে যাবেন।

জিনক্যাফ এরপর ডালিমকোটের জুঙপেনকে লেখা দেবরাজার চিঠি দেখিয়েছিলেন। মি. ইডেন খাম খুলে চিঠিটি পড়েছিলেন। চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছিল। জুঙপেন যেন মি. ইডেনের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যাবতীয় আয়োজন করেন, সে কথা লেখা ছিল। কিন্তু চিঠিটির কোথাও তাঁকে ফেরৎ পাঠানোর কোনও কথাই ছিল না।

খামে আর একটি চিঠি ছিল। ওই চিঠিটি অত্যন্ত ক্রোধ ও অসংযমতার ফসল। ওই চিঠিতে জুঙপেনকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে বলা হয়েছিল, তিনি যেন কোনও অবস্থাতেই মি. ইডেনকে ভুটান সীমান্তে ঢুকতে না দেন। জুঙপেনকে তীব্র ভাষায় গালিগালাজ করে লেখা হয়েছিল, তিনি যেন মি. ইডেনকে কোনওভাবে অসন্তুষ্ট না করে ফেরৎ পাঠানোর চেষ্টা করেন। তা যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তবে তিনি যেন মি. ইডেনকে সামচি ও ধোনের সড়কপথ ব্যবহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

জুঙপেনকে এ নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে, যে মি. ইডেন যদি একান্তই ফিরে না যান, তবে তিনি যেন প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করে দেন।

জিনক্যাফরা মি. ইডেনকে তাই কিছুটা ফিরে গিয়ে যেন সামচির পথ ধরে রাজদরবারে পৌঁছানোর অনুরোধ করেন। মি. ইডেন ওই প্রস্তাব মানেননি। ওতে বহু সময় অপব্যয় হবে। জিনক্যাফরা ভুটানের সরকারি আমলাদের মুর্খামির সমালোচনা করে, মি. ইডেনকে তাঁর পছন্দমত রাস্তা ধরেই এগিয়ে যেতে বলেছিলেন।

মি. ইডেন একজন জিনক্যাফকে কমিশনের পথের সাথী হবার জন্য অনুরোধ করলে, প্রথমে একজন রাজিও হয়েছিলেন। ওদেরকে ডালিমকোটে যেতে হবে। তারা অবশ্য গ্রাম থেকে একজন পথ প্রদর্শক সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন এবং ঘোড়াগুলির জন্য খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছিল।

মিশন যখন সইবিতে ছিল, তখন গ্রামপ্রধান সহ গ্রামবাসীরা সকলের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তারা মি. ইডেনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, ইডেনের নির্দেশ মত ওরা দার্জিলিং-এ বসবাস করার জন্য সইবি থেকে ফেরৎ পাঠানো লোকজনদের সঙ্গে যেতে পারেন। কিন্তু, দু'টি কারণে ওই মুহূর্তে তারা যেতে রাজি নন। প্রথমত আত্মীয় পরিজন ও বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে অন্য রাজত্বে যাওয়াটা কষ্টকর। ভুটান সরকার তাদের সব সম্পত্তি ছেড়ে অন্য রাজত্বে যাওয়াটা কষ্টকর। ভুটান সরকার তাদের সব বিষয় সম্মতি বাজেয়াপ্ত করে নেবে। দ্বিতীয়ত তাদের গ্রামে তিনটি ইউরোপিয়ান শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। দেশ যে ব্রিটিশদের হাতে চলে যেতে বসেছে, সেটা একটা পূর্বলক্ষণ। সুতরাং তারা ভুটানরাজের শাসনমুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকবেন।

মি. ইডেনের নির্দেশ মত শিশু তিনটিকে নিয়ে আসা হয়। দেখা যায়, ওই শিশুরা প্রকৃতই শ্বেতকায় এবং শ্বেতকেশ যুক্ত। কিন্তু তিনি গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ওটা কোনও দৈব ঘটনা নয়। এটা দুর্ঘটনা। ওরা যে কোনও ইউরোপীয় ব্যক্তির বংশধর, তা দাবি করার মত কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি।

ভোকুর/শফেরজায়ী/হা উপত্যকা/ডোরিকা ঃ ১০ ফেব্রুয়ারিতে মিশন সইবি থেকে রওনা দিয়ে ঢালু পথে সে-ছু নদীর পাড়ে এসে পৌঁছল। এরপর শুরু হল চড়াই। খাড়া পথ ধরে টাইগোন লা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেন তারা, পাহাড়ি গিরিপথ দিয়ে দুপুরের দিকে ৯,২৫৬ ফুট উচ্চতায় এক সমতলভূমিতে উপস্থিত হয়েছিল দলটি। স্থানটির নাম ভোকুর। সেখানে এক পাল চমরী গাই দেখেছিলেন ইডেন সাহেব। হয়ত উপরে প্রবল তুষারপাতের কারণে পশুগুলিকে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে।

সামনে পানীয় জল পাওয়ার সম্ভাবনা কম হবে এবং বরফও পুরু হবে— এ আশংকায় সেখানেই রাত্রিবাসের আয়োজন করা হয়েছিল। ১১ ফেব্রুয়ারিতে যাত্রা শুরু করলে ওই আশংকাই সত্য হয়েছিল। খাড়া পাহাড়ে পুরু বরফে শুধু মানুষ নয়, ঘোড়াগুলোরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। পরিবেশেরও আমূল পরিবর্তন। রডোডেনড্রনের অরণ্য উধাও, চারদিকে ম্যাগনোলিয়া, ওক, কাঠবাদামের গাছপালা। পাইন অরণ্য দেখে সকলে মুগ্ধ। এ যাবৎ ভ্রমণ পথে যত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘন অরণ্যই যাত্রীদল দেখে মুগ্ধ হোন না কেন, ওই অরণ্য সর্বাপেক্ষা নয়ন সুখকর।

সন্ধ্যার দিকে বরফে ঢাকা এবং পাথরে গড়া একটি যাত্রীনিবাস দেখে মি. ইডেন মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন— 'সন্ধেবেলা আমরা শাফেরজায়ীতে এসে থামলাম। এখানে পুরু বরফ জমে আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকজন আমাদের সকলের আরামের জন্য তৈলবৃক্ষ জুনিপার ও পাইন গাছের ডাল বরফের উপর স্তূপ করে আগুন ধরিয়ে দিল। ওই আগুন সারারাত জ্বলে আমাদের আরাম দিয়েছিল। এই ক্যাম্পটি ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১,৮০০ ফুট উঁচুতে। থার্মোমিটারে পারদ নেমেছে ১৩ ডিগ্রিতে। কিন্তু তবুও কোনও শিখ বা বাঙালিসহ প্রায় দু'শ লোকের দলটির একজনও ওই শীতে সেদিন কষ্ট পায়নি।'

স্থানটি ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। কোনও কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। এ অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন অস্টেন এলাকার মানচিত্র রচনা এবং তদনুযায়ী নিজস্ব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি আরও দু' একদিন সেখানে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মিশন যদি এগিয়েও যায়, তবে তিনি এগিয়ে গিয়ে মিশনকে ধরতে পারবেন।

গিরিপথের খুব কাছাকাছি পান্থশালাটিতে ক্যাপ্টেন অস্টেন ও তাঁর কয়েকজন সহকারীকে রেখে মিশন ১২ ফেব্রুয়ারিতে যাত্রা শুরু করে। দলটি পাহাড়ি বড় বড় পাথুরে পাহাড়ি মুখ পেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসেছিল। গিরিপথ ধরে নামতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল ঢালু পথটিও বেশ খাড়া।

ওই পথের ধারে এক সুন্দরী ঝরনা ছিল। কাঠের সাঁকোতে কমপক্ষে দশবার ওই ঝরনাটিকে পেরোতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মি. ইডেনের মন্তব্য— 'বরফের উপর দিয়ে পথ তৈরি করে হাঁটতে সবারই খুব কষ্ট হচ্ছিল। বিশেষত জলধারা যেখানে বরফের আস্তরণে ঢাকা, সেখানে এক মণের মত বোঝা কাঁধে নিয়ে বরফ সরানো খুব কঠিন কাজ। ছোট ছোট জলপ্রপাতগুলিও বরফে পরিণত হয়েছে এবং লম্বমান বরফের চাঁইগুলি কুড়ি ফুটের মত লম্বা।'

আরও কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে গিয়ে মিশন হা উপত্যকায় পৌঁছেছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যে স্থানটি একটা কৃত্রিম উদ্যান (পার্ক)। সেখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছিল। স্থানটির নাম ডোরিকা। হা-ছু নদীর ধারে ছোট্ট একটু সমতলভূমি। ওই স্থানে পৌঁছানোর কয়েক মাইল আগে সামচি ও ধোনি অতিক্রমকালে মিশনটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ওই রাস্তা ধরে পারো থেকে বাংলার ডুয়ার্সে এবং পশ্চিম ভুটানে যাওয়া যায়।

ডোরিকা থেকে রওনা দিয়ে (১৩ ফেব্রুয়ারি) কাঠের সেতু হা-ছু নদী পেরিয়ে সুন্দর উপত্যকা ধরে দলটি একটা ভাল রাস্তায় এগতে থাকে। পতের ধারে কয়েকটি তিনতলা বাড়ি সহ একটা সমৃদ্ধ বসতির ভগ্নদশা নজরে পড়তে থাকে। দলটি লক্ষ্য করে বাড়িগুলো ফাঁকা। কমিশন জানতে পারে যে, শীতকাল কাটাতে অধিবাসীরা সামচিতে (চামুর্চি) চলে গিয়েছিলেন। সেখানকার প্ররকৃতিও বেশ মনোমুগ্ধকর। তিব্বতের পর্বতের চূড়া দূর থেকে চোখে পড়ে। ওই উপত্যকায় পোয়া মাইল জুড়ে সমতলভূমি এবং প্রায় ষাট ফুট চওড়া হা-ছু নদী। সদ্য পেরিয়ে আসা কোলাহল মুখর জলস্রোতের যেন অপূর্ব সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে নদীটি। সাঙবেতে যেমন দেখা গিয়েছিল, এখানকার জমিগুলিও পাথুরে আল দিয়ে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। নদী থেকে নালা কেটে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নদীর উপরেও একাধিক সেতু।

সকালের দিকেই দলটি হা-তামপিয়েনে পৌঁছে গিয়েছিল। যেতে যেতে সেখানে দলে দলে প্রচুর ভেড়া, ইয়াক ও অন্যান্য গবাদি পশুকে বরফঢাকা পথের প্রান্ত দেশে চড়তে দেখেছিলেন দলটি। গ্রামগুলিও বেশ ঘন বসতিপূর্ণ। গ্রাম থেকে বহু লোক এসে মিশনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

তবে, ওই গাঁয়ের লোকগুলি অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র। এঁরা প্রতি বাড়িতে দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখেন। ঘরে তো আর বিদেশি লোকেদের বাড়ির মত ধোঁয়া বের হবার চিমনি নেই। ফলে পোড়া কাঠের ধোঁয়ায় এদের চোখমুখে যেন ভুসা কালি মাখানো। হয়ত জলের অভাবে ভালভাবে হাতমুখ ধোয় না এরা। একটা ক্রমোন্নত সভ্যতার একটা মাইল ফলকের মত গ্রামবাসীদেরকে মনে করেছিলেন যাত্রী দলের সদস্যরা।

মিশনের আগমনবার্তা শুনেই স্থানীয় জুঙপেন দলটির জন্য কিছু জ্বালানি কাঠ, ঘোড়ার খাদ্য এবং মারুয়া জাতীয় দানা শষ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পরের দিন (১৪ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় জুঙপেন এসে মি. ইডেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইডেনের বর্ণনা থেকে জানা যায়—

'জুঙপেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারের লোকজনও ছিল। তাঁর স্ত্রী হলেন পারোর পেনলোর কন্যা। উনারা ক্যাম্পে অনেকক্ষণ ছিলেন। কিছু রহস্যজনক জিনিষ, কিছু কৌতূলউদ্দীপক দ্রব্যাদি আমাদের সঙ্গে আছে মনে করে ওদের চোখ যেন কিছু খুঁজেই চলছিল। ওরা আমাকে এখানে আর একদিন থাকতে এমনভাবে অনুরোধ করলেন যে, আমি আর না বলতে পারলাম না। এ ছাড়া ক্যাপ্টেন অস্টেন এখানে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, এমন একটা সম্ভাবনার জন্য প্রতীক্ষাও করছিলাম।

একই সময়ে পারোর পেনলোর স্ত্রী-ও তাঁর মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনিও আমার সাথে দেখা করে আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, তাঁর স্বামী প্রতিনিধি দলটিকে অবশ্যই বন্ধুভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।'

সেখানকার দুর্গটি ছোট্ট ও সুন্দর চারতলা একটি দালান। ভুটানি স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন সেটি। দুর্গের প্রবেশ তোরণটি দুর্গের চাইতেও উঁচু এবং সেটি দুর্গ থেকে ৮০ ফুট দূরে অবস্থিত। জুঙপেনের অধীনস্থ এক একটি কর্মচারী ওই প্রবেশ তোরণটি দখল করে তাঁর প্রভু জুঙপেনকেই যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

দুর্গ থেকে দু'মাইল দূরে সুন্দর একটি বৌদ্ধমঠ ছিল। সেটির কাছাকাছি ছিল একটি কালো মন্দির। সর্পবিষ থেকে রক্ষাকারিণী বিষহরা দেবীর মন্দির ছিল সেটি। ভুটানি সংস্কৃতিতে সর্পদেবীর পুজোর এটি অন্যতম নিদর্শনও বটে।

উপত্যকায় আর একটু উপরে উঠে বেশ কয়েকটি সুন্দর সুন্দর গ্রাম দেখা গিয়েছিল। ওই অঞ্চলে ভুটানের সর্বাপেক্ষা ধনী লোকের বসবাস করতেন। তবে জায়গাটির অরাজক হিসেবে কুখ্যাতি ছিল। সেখানে নাকি ডাকাতদের সংখ্যাও কম ছিল না। তিব্বতের নৈকট্যই জনপদবাসীকে বেশি স্বাধীনতা প্রদান করেছিল। সীমান্তও ছিল মাত্র কয়েক মাইল দূরে। ফলে, জনসাধারণকে একটু শাসন করলেই, তারা দৌড়ে সীমান্তের ওপারে চলে যেতেন।

তবে, ওই এলাকাবাসী বেশ ভদ্রভাবে মি. ইডেনের সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ভদ্রতা, নম্রতা, কৃতজ্ঞতা ও সত্যবাদিতায় যেন তাঁরা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। তাঁবুর কাছাকাছি ছিল একটা উষ্ণ জলস্রোত। অধিবাসীরা সেটিকে বেশ ওযুধিসম্পন্ন প্রস্রবন বলে মনে করেন। বিশেষত চর্মরোগ, বাত ব্যাধিতে ওই জল নাকি মহৌষধ।

সিকিমের ধাতুময় ঝরনাগুলোর মত এখানেও গরম পাথর ছুঁড়ে মারা হত।

রাতে এত বরফ পড়েছিল যে, শিবিরের চারপাশে দু' ফুট পুরু হয়েগিয়েছিল। সকালবেলা জুঙপেন, ছেলে-মেয়ে ও অনুগামীদের নিয়ে ক্যাম্পে এসে হাজির হয়েছিলেন। ওদের দাবি, মিশনের লোকজন ঠান্ডায় কষ্ট পাননি। তাঁরা ফারগাছের লম্বা খুঁটি ও খড় সঙ্গে নিয়ে এসে সিপাহীদের তাঁবু ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন এবং এ আব্দারও করতে থাকেন যে ওদের নিজেদের গ্রামে মিশনের লোকজন ও কুলিরা থাকতে পারেন।

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি সারাদিন বরফ পড়তেই থাকল। ফলে, তাঁবু থেকে লোকজন বের হতেই পারেননি। ওই অবস্থাতেও পরের দিন ক্যাপ্টেন অস্টেন ফিরে এসেছিলেন। উনার জন্য উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। আরও দেরি করলে, গ্রামবাসীদের, ছড়ানো গুজব, ক্যাপ্টেন অস্টেন ঠান্ডায় মারা গেছেন, ওটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হত।

মিশন চলে যাবার পর ক্যাপ্টেন অস্টেন ভেবেছিলেন যে, প্রকৃতির খামখেয়ালি ভাবটা সাময়িক। বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেলেই তিনি মন মাতিয়ে অনুসন্ধান কর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু, যখন তিনি নিরাশ হলেন, তখন তিনি মিশনের যোগদানের জন্য রওনা দিয়েছিলেন। পথে নামতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, কোথাও কোথাও বরফ বুক সমান গভীর। প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে তিনি একসময়ে সঙ্গীসাথীদের থেকে দলছুট হয়ে পড়েছিলেন। ডোরিকায় পৌঁছে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, চারজন লোক হারিয়ে গেছেন। ক্যাপ্টেন অস্টেন পুনরায় তাদের খুঁজতে গিয়ে গিরিপথের চূড়ায় দু'জনের মৃতদেহ দেখতে পান। সাঙবের প্রাক্তন জুঙপেন ওই পথে চলার সময়ে দু'জন কুলির মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন।

'আপনা মাংসে আপনা বৈরি' হয়ত হতে পারে হরিণেরা। কিন্তু নিলয় না জানা, মালবহনকারী কুলিদের মৃতদেহ উদ্ধারের কারণ হয়ে উঠেছিল আমৃত্যু রক্ষাকারী আমানত। প্রাক্তন জুঙপেন ও তাঁর লোকজন গিরিপথের বরফের তলায় ক্যাপ্টেন অস্টেনের বাক্সগুলো দেখতে পেয়ে তা তুলতে গিয়ে কুলিদের মৃতদেহ দুটি দেখতে পেয়েছিলেন। জুঙপেন বাক্স ভেঙে সম্পদ নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ওই সম্পদ ফিরে পেতে ক্যাপ্টেন অস্টেনকে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

১৭ ফেব্রুয়ারিতে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, মিশন সেদিন আর যাত্রা শুরু করতে পারেনি। কারণ, গোটা পথ সুগভীর বরফে ঢাকা এবং শীতও প্রচণ্ড। থার্মোমিটারের কাটা ১১ ডিগ্রি থেকে নট নড়ন-চড়ন।

মি. ইডেন ওই সময় শুনতে পেয়েছিলেন যে, ভুটানের সরকারি একটি প্রতিনিধি দল তাঁদেরকে ফিরে যাবার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসছে। স্থানীয় জুঙপেন এজন্যই আদর আপ্যায়ন করে তাঁদের সেখানে থাকতে চাপ সৃষ্টি করেছেন। মি. ইডেন ওই অগ্রসরমান প্রতিনিধি দলকে নিরাশ করতেই, সেদিনই হা-তামপিয়েন ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারোর উদ্দেশে রওনা দেবেন। এখন পেনলো কীভাবে যাত্রাভঙ্গ ঘটান, সেটাই দেখার।

মি. ইডেনের অভিপ্রায় স্থানীয় জুঙপেনের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। তিনি আশা করেছেন প্রচণ্ড সূর্যতাপে বরফ গলে যাবে এবং তিনি ১৯ তারিখে রওনা দেবেন। যাত্রা শুরুর দিন প্রথমে ক্যাপ্টেন অস্টেন, ডা. সিম্পসন ছেবু লামার লোকজনদের নিয়ে প্রথমে রওনা দিয়েছিলেন। সিকিমরাজের পাঠানো হাড্ডাগোড্ডা ২০ জন লোকও সঙ্গে ছিল। ওই দলের পায়ের চাপে পথ তৈরি হবে এবং মি. ইডেন কয়েক ঘণ্টা পরে সঙ্গীসাথীদের এবং মালপত্র নিয়ে রওনা দেবেন

জুঙপেন মহোদয়ের অনুমান করতে কষ্ট হল না যে, মি. ইডেন সেখান থেকে চলে যাবেন। তাই তিনি কয়েকজন লোককে নিয়ে বেশ রাগত স্বরেই জানালনে যে মিশন সেখান থেকে যেতে পারবে না। মিশনকে আটকানোর জন্য তাঁর কাছে সরকারি নির্দেশ আছে। যতক্ষণ সরকারি প্রতিনিধিদল সেখানে না আসছে, ততক্ষণ মিশনকে সেখানেই থাকতে হবে। কিন্তু মি. ইডেন সরকারি নির্দেশনামা দেখতে চাইলে, তিনি তা দেখাননি। মি. ইডেন যখন

জুঙপেনকে জানিয়েছিলেন যে, মিশনের অর্ধেক লোক কয়েক ঘণ্টা আগে রওনা দিয়েছেন এবং সম্ভবত পারো যাবার অর্ধেক পথ পেরিয়েও গেছেন, তাদেরও আর দেরি না করে রওনা দেওয়া উচিত, তখন জুঙপেন আরও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। মি. ইডেন অবশ্য ওঁকে কিছু পারিতোষিক দিয়ে শান্ত করতে পেরেছিলেন। বিনিময়ে জুঙপেনকেও শপথ করতে হয়েছিল যে, মি. ইডেন জুঙপেনের নিকট থেকে কোনও সাহায্য পাননি।

চেউলা গিরিপথ ঃ বিকেলবেলা তিনটে নাগাদ মি. ইডেন এগিয়ে যাওয়া ক্যাপ্টেন অস্টেনের নেতৃত্বের দলটির সঙ্গে মিলিত হতে পরেছিলেন। যে বরফে এর আগে কেউ পদার্পণ করেনি, ওই বরফের উপর পা ফেলে দুর্বল ও অশক্ত কুলিরা বহু কষ্টে ঢালু পথে নামছিল। এই গিরিপথের শেষপ্রান্ত তখনও আধ মাইলের মত উঁচুতে এমন সময় মি. ইডেনের কানে খবর পৌঁছাল যে শেষ প্রান্তে রাত কাটানোর মত একটা আশ্রয় জুটতে পারে। ওই বিশ্বাসেই তাঁরা পথটি অতিক্রম করাই স্থির করেছিলেন। কিন্তু পথের বরফ ক্রমে এতই গভীর হয়ে উঠেছিল যে, ওই গভীরতা কোথাও কোথাও তিন থেকে আট ফুটের মত। ঘোড়া ও খচ্চরগুলির বুক-পিঠ বরফে ঢেকে যেতে থাকে, দেরিও হতে থাকে ক্রমশ।

সন্ধে পাঁচটার সময়ে গিরিপথের শীর্ষদেশে পৌঁছেছিল দলটি। মি. ইডেন ভেবেছিলেন, হয়ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তা হয়নি। তিনি ডা. সিম্পসন ও ক্যাপ্টেন অস্টেনকে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবার কথা বলে নিজে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

সে মুহূর্তে ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে বেশ কয়েকজন কুলি বরফের উপরেই শুয়ে পড়েছিল এবং ঘুমিয়ে পড়েছিল। কয়েকজনকে দেখে মনে হয়েছিল যে, ওদেরকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এবং একই সঙ্গে শীতে ও ক্লান্তিতে ওই অবস্থা। দিনের শেষে পথশ্রমের ও সমস্যার অবসানের যে প্রত্যাশা এদের মনে জেগে উঠেছিল, তা অপরিপক্ক চেতনা মাত্র। কারণ, যে দলটি এগিয়ে গিয়েছিল, তারা জানিয়েছিলেন যে, বরফ আরও গভীরতর হচ্ছিল। ঘোড়া ও খচ্চরগুলি কোনওক্রমে শুধুমাত্র মুখ বাড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছিল। মি. ইডেনের বর্ণনা নিম্নরূপ—

'সন্ধের শুরুতে আমরা যখন গিরিপথে, তখন কুলিরা শুধু একটাই প্রার্থনা করছিল— দয়া করে আমাদের একটু শুতে দিন, আমরা মরতে রাজি আছি। তখন একটুখানি থামা মানে অবধারিত মৃত্যু। কারণ, সেখান থেকে ডাইনে বা বাঁয়ে যাবার কোনও পথ নেই। আমরা শুধু সবাইকে এগিয়ে যেতেই বলছিলাম এবং সাহস জুগিয়েই চলছিলাম। কিন্তু এক ঘণ্টায় এক পোয়া মাইলও এগতে পারছিলাম না। অবশ্য কপাল ভাল যে, আবহাওয়া একটু ভালর দিকে। মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে। রাত প্রায় এগারটার সময়ে আমরা একটা বনে এসে ঢুকলাম। এ বনেই আশ্রয় নিতে হবে। কারণ, এ বন আমাদেরকে হাওয়ার দাপট থেকে বাঁচাবে। তাছাড়া এ জায়গায় বরফও কম। কুলিরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনেকে মুর্চ্ছিত হয়েছে। তাই আমি তাদের ১২ জনের করে একটি দল করে এক একজন সর্দারের নেতৃত্বে আশপাশের লোকজনের বাড়ি খুঁজে সেখানে রাত কাটাবার নির্দেশ দিলাম। তারা যেন সেখানে আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের শরীর গরম রাখে। আর, তারা যে মালপত্র বহন করছিল, সেগুলো রাস্তার উপরেই পরে থাকুক। পরের দিন সকালে এসে ওরা মালপত্রের দায়িত্ব নেবে।

কুলিরা ও অন্যান্যরা ওই আদেশ পালন করতে বেরিয়ে পড়ল। আমরা আমাদের ভার অনেকটাই কমিয়ে ফেললাম। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল ঘোড়া ও খচ্চরগুলির জন্য। ওরা পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে পথ চলছিল। ওরা কাঁধে বোঝা নিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল, তবুও তো সঙ্গে ছিল।'

এমন মারাত্মক সমস্যা পশুরা মোকাবিলা করতে পারে, বরফের পথে শক্তির সমতা রক্ষা করতে পারে। বরফের কামড়ে জীর্ণ কুলিরা পিঠে এক-দেড় মণ বোঝা নিয়ে পাহাড়ি পথে উপরে উঠতে কী কষ্টটাই না করেছিল।

মধ্যরাত অতিক্রান্ত হতে চললেও মি. ইডেন ওই গিরিপথের শেষে কল্পিত গ্রামের নামগন্ধও খুঁজে পাননি। রাত প্রায় একটার সময়ে (২০ ফেব্রুয়ারি) একটি তিব্বতি কুকুরের ডাক শুনে বসতি সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আগের দিন সকাল ন'টা থেকে এত রাত পর্যন্ত একটা দানাও পেটে পড়েনি। দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টার একটানা যাত্রাপথে সকলেই ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। ওই গ্রাম খুঁজে সেখানে রাত কাটিয়ে কুলিরা সকাল ন'টায় ফিরে এসে রাস্তায় ফেলে রাখা মালপত্র পুনরায় নিজেদের হেপাজতে নিয়েছিল।

যে গিরিপথ গত রাতে অতিক্রম করা হয়েছিল, সেটির নাম চেউ-লা গিরিপথ। ওই গিরিপথের উচ্চতা ১২,১৯০ ফুট আর যে গ্রামে ওরা রাত কাটিয়েছিল, সেটিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,০৬৭ ফুট উঁচুতে।

ভুটান সরকার যে প্রতিনিধি দলটিকে মি. ইডেনের গতিরোধ করতে পাঠিয়েছিল, ওই গাঁয়েই ওই প্রতিনিধি দলটিকে দেখা গিয়েছিল। তুষার ঝড় শুরু হওয়ার সময়ে সরকারি প্রতিনিধি দলটি গিরিপথ অতিক্রম করতে চেয়েছিল। হা-তামপিয়েন থেকে মি. ইডেনের যাত্রারম্ভের পূর্বেই তারা সেখানে হাজির হতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা তারা কার্যত পারেনি। মিশন শেষ পর্যন্ত চলে আসায় উপায়ন্তর না দেখে তারা পারোতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। ওই সিদ্ধান্তে সকলে একমত না হওয়ায় হৈ চৈ, চেঁচামেচি হচ্ছিল। শেষে হাতের কাছে সব জিনিস পেয়েছিল তা নিয়ে, এমনকি এক শিখ প্রহরীর গাদা বন্দুকটি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছিল দুপুরের আগে থেকেই। ওই প্রতিনিধি দল ওই গ্রামেরই একটি বৌদ্ধ মঠে শৈত্যপ্রবাহ ও তুষারপাত শুরু হওয়ার ফলে দিন সাতেক থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। একই মঠে সেদিন মধ্যরাতে মিশনের কিছু লোকজনও আশ্রয় নিয়েছিলেন। সরকারি প্রতিনিধিরা লোকজনদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। ভৃত্যবাহিনীর কয়েকজন তো মিশনের লটবহর নেবার চেষ্টা করেছিল। রান্নার বাসনপত্র নেবার চেষ্টা করেছিল। মঠের সান্ত্রীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছিল।

বিকেলের দিকে কয়েকজন জিনক্যাফ মি. ইডেনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে দেবরাজার একটি চিঠি তুলে দিয়েছিলেন। ওই চিঠিতে ভুটানরাজ মি. ইডেনকে কিছু নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। ইডেন যেন জিনক্যাফদের সঙ্গে সীমান্তে ফিরে গিয়ে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। জিনক্যাফকে যেন তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একই সঙ্গে অসম-ডুয়ার্সের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাটি যেন পুরনায় চালু করার ফয়সলা করে নেন। ব্রিটিশ সরকারের অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে ভুটান সরকার তদন্ত করবে।

সীমান্তে ফিরে গিয়ে আলোচনা ফলপ্রসু হলে জিনক্যাফরা যদি মনে করে, এবং মি. ইডেনের পক্ষে ভুটানের রাজদর্শনকে জরুরি বলে মনে হয়, তবে জিনক্যাফরা ইডেনকে ভুটানের রাজধানী পুনাখায় যাবার অনুমতি দিতে পারে। মি. ইডেন তবেই ভুটানের দেবরাজা ও ধর্মরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পাবেন। তিনি যেন দার্জিলিং ফিরে না যান।

দেবারাজার এ চিঠিটিও স্ববিরোধিতা, ছলনা ও চাতুর্যে ভরা। উনি মি. ইডেনকে সীমান্তে যেতে বলেছেন, দার্জিলিং-এ ফিরে যেতে নিষেধ করেছেন এবং রাজধানীতে অভ্যর্থনা জানাতে অস্বীকার করেননি। কিন্তু বলেছেন, 'সীমান্ত নিয়ে উদ্ভুত সমস্যাগুলির তদন্তটা প্রথমে হওয়া ভাল। তাছাড়া, অসম-ডুয়ার্স এবং আমবাড়ি ফালাকাটা থেকে যে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে, তা তো ভুটান সরকারকে অবশ্যই প্রদান করা উচিত।'

মি. ইডেন কিন্তু জিনক্যাফদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, হয় তিনি দার্জিলিং-এ ফিরে যাবেন, নতুবা পুনাখায় যাত্রা অব্যাহত রাখবেন। জিনক্যাফরা তাঁকে দার্জিলিং-এ ফিরে না যেতে অনুরোধ করেন। বলেন, ওরা আগে গিয়ে পুনাখায় তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর উদ্যোগ নেবেন। মি. ইডেন যেন পুনাখা যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

পুনাখার উপান্তে পারো-তে ঃ ২১ ফেব্রুয়ারিতে মি. ইডেন পুনাখার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পথে কয়েকজন পথ চলতি মানুষের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। ওঁরা দলটিকে পারোতে প্রাসাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে কোনও স্থানে অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, পারোর পেনলো মিশনটিকে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে সাদরে অভ্যর্থনা করতে চান। আর সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কিছুটা সময়ের দরকার।

মিশন ওই প্রস্তাব মেনে নিয়ে পারোর অদূরে একটা দিন অপেক্ষা করেছিল। ফলে, ২২ ফেব্রুয়ারিতে মিশন পারোতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে, শেষ পর্যন্ত মিশনকে অভ্যর্থনা জানানোর কোনও আয়োজন লক্ষ্য করা যায়নি। মিশনকে টানা দু' ঘণ্টা তপ্ত বালুকাময় সমভূমিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। খোলা মাঠে বাতাসের ঝাপটা কম ছিল না। আবার তাঁবু টাঙানোর অনুমতিও নেই। যেখানেই তাঁবু টাঙানোর কথা ভাবা হচ্ছিল, সবখানেই আপত্তি। কারণ ওই স্থানটি নাকি বনদেবী ও নদী রাক্ষসের বিচরণভূমি ও পবিত্র স্থান।

বহুক্ষণ বিলম্বের পর কয়েকজন আধিকারিক দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা তাঁবু টাঙানোর জন্য যে স্থানটি নির্দেশ করেছিলেন, ওই স্থানে তাঁবু টাঙাতে পূর্বে ওঁরাই নিষেধ করেছিলেন। মিশন আর কথা না বাড়িয়ে তাঁদের মনোমত জায়গায় তাঁবু টাঙাতে থাকেন, শিবির স্থাপন করেন।

কিছুক্ষণ পরে পারোর পেনলোর পাঠানো কিছু কমলালেবু এবং কিছু তিব্বতি রুটি নিয়ে এসেছিলেন কয়েকজন। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান করার জন্য কেউ হাজির হননি।

(আগামী সংখ্যায়)

কেন পাকিস্তানি গবেষকরা বলছেন গান্ধী মুসলিম মৌলবাদের জনক?

সুমন ভট্টাচার্য

গান্ধীজী কি মুসলিম মৌলবাদকে মদত জুগিয়েছিলেন? মহাত্মার মদতেই কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে?

না, এটা কোনও আরএসএস-এর তত্ত্ব বা সঙ্ঘ পরিবারের 'গোপন প্রচার' নয়। বরং যে মুসলিমদের তোষণের জন্য হিন্দুত্ববাদীরা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওরফে মহাত্মা গান্ধীকে বারবার কাঠগড়ায় তুলেছেন, সেই মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যেই অধুনা এই মতামতটি প্রকাশের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এবং জানলে অবাক হতে হবে, দেশভাগের পর যে পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়ার ক্ষোভে নাথুরাম গডসে গান্ধীর উপর গুলি চালিয়েছিলেন, সেই পাকিস্তানের আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকই গান্ধীকে মুসলিম মৌলবাদকে জাগিয়ে তোলার দায়ে 'অভিযুক্ত' করছেন।

ড. মুবারক আলি, যিনি ২০১১ সালে 'পাকিস্তান ইন সার্চ অফ আইডেন্টিটি' বই লিখে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন, তিনি যেমন পরিস্কারই লিখেছেন, খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীজী সমর্থন না করলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামি মৌলবাদ মাথা চাড়া দিত না। অক্সফোর্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত মোবারক আলির বইটি পাকিস্তান নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বলে পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমগুলি তো বটেই, এমনকি 'গার্ডিয়ান' বা 'ওয়াশিংটন পোস্ট'ও সম্মান দেয়। মুবারক আলিই প্রথম নন, এর আগে খাবিদ বিন সাঈদ তাঁর 'পাকিস্তানক্স ফরমেটিভ ইয়ারস' বইতে পরিষ্কারই বলেছিলেন, মৌলবী এবং উলেমাদের রাস্তায় নেমে রাজনীতি করতে এবং জনমতকে প্রভাবিত করতে শিখিয়েছিল খিলাফৎ আন্দোলন। পাকিস্তানের এই দুই ঐতিহাসিক যে সময় এই কথা লিখছেন, মনে রাখতে হবে সেই সময় ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ সবচেয়ে আলোচিত এবং বিতর্কিত বিষয়। এই তালিবান ও আইএস উত্তর পৃথিবীতে ধর্ম কীভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে, রাষ্ট্রকে গভীর চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দিতে পারে, তার অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়ে গিয়েছে। নয়াদিল্লি বা ওয়াশিংটন থেকে নয়, পাকিস্তানি দুই ঐতিহাসিক তাঁদের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে গান্ধীকে কঠোর সমালোচনায় বিঁধেছেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে গতি দিতে গিয়ে খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থনের জন্য এবং ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির গাটছড়াটি বেঁধে দেওয়ার জন্য।

যে কোনও রাজনীতি বা সমাজবিজ্ঞান চর্চার পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। মুবারক আলি বা হাফিজ বিন সাঈদদের হয়ত সেই কারণেই পুরোপুরি 'নিরপেক্ষ' বলা যাবে না। কারণ ইতিহাস, রাজনীতি এবং ধর্মের সংযোগ খুঁজতে গিয়ে তাঁরা যেমন ভারত রাষ্ট্রের 'পিতা' গান্ধীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন, তেমনই খুব বিনম্রভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের 'কায়েদ-ই-আজম' মহম্মদ আলি জিন্না গান্ধীর ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। জিন্না পরিষ্কারই বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে মেলানোর কোনও দরকার নেই।

পাকিস্তানি তাত্ত্বিকদের এই ধর্ম এবং রাজনীতির গাটছড়া নিয়ে চিন্তার এবং তর্ক তোলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্মই ধর্মীয় কারণে এবং জিন্নার 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'র নীতিকে অনুসরণ করেই, কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর থেকেই রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান বার বার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে মৌলবী বা উলেমাদের কাছ থেকে। সেটা তালিবান আন্দোলন এবং পরে তালিবান জঙ্গিদের উত্থান থেকে পারভেজ মুশারফের আমলে লাল মসজিদের ঘটনা বা একেবারে হাল আমলে ইমরান খানকে মৌলবীদের চ্যালেঞ্জ, বারে বারে প্রমাণ করেছে যে আমাদের এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি ধর্মীয় 'ফতোয়া'র সামনে কতটা ভঙ্গুর এবং আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়েই মুবারক আলি, সাঈদের মতো ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন এই যে 'ফতোয়া' দিয়ে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো সেটা কিন্তু প্রথম শুরু হয়েছিল খিলাফৎ আন্দোলনের সময়।

যে কোনও রাজনীতি বা সমাজবিজ্ঞান চর্চার পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। মুবারক আলি বা হাফিজ বিন সাঈদদের হয়ত সেই কারণেই পুরোপুরি 'নিরপেক্ষ' বলা যাবে না। কারণ ইতিহাস, রাজনীতি এবং ধর্মের সংযোগ খুঁজতে গিয়ে তাঁরা যেমন ভারত রাষ্ট্রের 'পিতা' গান্ধীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন, তেমনই খুব বিনম্রভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের 'কায়েদ-ই-আজম' মহম্মদ আলি জিন্না গান্ধীর ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। জিন্না পরিষ্কারই বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে মেলানোর কোনও দরকার নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা যখন অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যকে ভাগ করার এবং খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ভারতীয় উপমহাদেশে খলিফার সমর্থনে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেটাই খিলাফৎ আন্দোলন। আমাদের মনে রাখতে হবে জিন্নার মতই আর একজন মুসলিম, যিনি সরাসরি এবং কঠোর ভাষায় গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি কাজি নজরুল। হয়ত তখনও নজরুল কবি হিসাবে, বুদ্ধিজীবী হিসাবে এবং সর্বপরি 'মুসলিম আইকন' হিসাবে এতটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেননি, কিন্তু তিনিও জিন্নার মত সোচ্চারে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে এভাবে মিলিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন।

আজকে এই ২০১৯ এ দাঁড়িয়ে গান্ধী, খিলাফৎ আন্দোলন এবং মুসলিম মৌলবাদকে আবার পর্যালোচনা করার কারণ কী? কারণ গত শতাব্দীতে যদি, 'যদি', মহাত্মা গান্ধী এই ভুল করে

থাকেন তাহলে আসলেই তিনি শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নয়, সামগ্রিকভাবে এশিয়ার রাজনীতিতে এক সাংঘাতিক প্রবণতার জন্ম দিয়েছিলেন। একবার ঐতিহাসিকভাবে বিবেচনা করে দেখা যাক খিলাফৎ আন্দোলন আসলে কী বলছিল এবং কী চাইছিল? এবং তার প্রতিস্পর্ধীই বা কী ছিল? যদি ঐতিহাসিক এবং সামাজিকভাবে আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব সেই সময় তুরস্কে খলিফার প্রতিস্পর্ধী হিসাবে উঠে আসছিল কামাল পাশার নেতৃত্বধীন তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ১৯২৩ এর মধ্যে মুস্তাফা কামাল পাশা তুরস্ককে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে শুধু পরিণত করেন তাই নয়, খলিফার হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা চলে যায় সেই দেশের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে। অর্থাৎ চুম্বকে বলতে গেলে তুরস্ক খলিফার শাসন মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়।

আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা হিসাবে মুস্তাফা কামাল পাশা যতটাই ইতিহাসে বর্ণময় চরিত্র, ততটাই হয়তো প্রাতঃস্মরণীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্যে জোর দিয়ে তুরস্ককে একটি শুধু আধুনিক রাষ্ট্র করা নয়, ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এবং দেশ গড়ার জন্য মুস্তাফা কামাল পাশাকে ইতিহাসবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিকেরা আলাদা সম্মান দেন। তাহলে কী দাঁড়াল? মুস্তাফা কামাল পাশা বা তুরস্কের জাতীয়তাবাদীরা যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা যে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন করছিলেন, মহাত্মা গান্ধী এবং খিলাফৎ আন্দোলনকারীরা তার বিরুদ্ধশক্তি, বা আরও পরিস্কার করে বলতে গেলে 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি'কে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতবর্ষে হাতে হাত মিলিয়ে রাস্তায় নেমে গিয়েছিলেন। যে কোনও ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে আমাদের সেই সময়কার তুরস্কের 'খলিফা'কে প্রতিক্রিয়াশীল এবং মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বাধীন তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রগতিশীল বলতেই হবে।

ইতিহাসের কী আশ্চর্য সমাপতন দেখুন, এই ২০১৯এ দাঁড়িয়ে যখন আমরা খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর সমর্থন, প্রতিবাদ জানিয়ে জিন্নার চিঠি এবং নজরুলের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করছি, তখন তুরস্কেও আবার উলটপুরণ ঘটছে। মুস্তাফা কামাল পাশার আধুনিক তুরস্ককে আবার 'ইসলামিক খলিফা'র শাসনের দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন সেদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান এরদোগান। মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন আইএস-এর সঙ্গে এরদোগানের সম্পর্ক, সেই জঙ্গি সংগঠনের সাথে তাঁর পারিবারিক ব্যবসা, তুরস্ক রাষ্ট্রে আবার ধীরে ধীরে ধর্মীয় প্রভাব বাড়ানো, এই সবই গোটা বিশ্বকে চিন্তিত করে রেখেছে। এবং ওই সমাপতনের সূত্র ধরেই আজকের এরদোগানের তুরস্ক পাকিস্তানের পরম বন্ধু। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বিরোধিতায় ইমরান খানের পাকিস্তানের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন 'খিলাফৎ' ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে বিভোর এরদোগান।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের নব্য ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকরা যখন এশিয়ায় মুসলিম মৌলবাদকে জাগিয়ে তোলার জন্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে চিহ্নিত করেন এবং বিভিন্ন ঘটনা, ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে কীভাবে খিলাফৎ আন্দোলন পরবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়েছিল, তার ব্যাখ্যা করেন, তখন আমাদের তা মন দিয়ে শুনতেই হয়। পাকিস্তানি মুসলিম ঐতিহাসিকদের পরিষ্কার বক্তব্য, খিলাফৎ আন্দোলনের সময় যে 'মুসলিম আন্তর্জাতিকতাবাদ' বা মুসলিম ব্রাদারহুড-কে জাগিয়ে তোলা হয়, তাই পরবর্তীকালে এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত মুসলিম মৌলবাদের চেহারা নেয়। উদাহরণ হিসাবে তাঁরা বলছেন, খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ আর মুসলিমদের জন্য বাসযোগ্য নয় বলে যে ডাক দিয়েছিলেন, এবং কোনও মুসলিম শাসনাধীন দেশে চলে যাওয়ার জন্য ভারতীয় মুসলিমদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারই পরিণতিতে সিন্ধ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দলে দলে মুসলিমরা আফগানিস্থানের দিকে যেতে শুরু করেন। যেহেতু আফগানিস্থানে তখন একজন মুসলিম 'আমির'-এর শাসন ছিল।

ইতিহাসের কী আশ্চর্য সমাপতন দেখুন, এই ২০১৯এ দাঁড়িয়ে যখন আমরা খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর সমর্থন, প্রতিবাদ জানিয়ে জিন্নার চিঠি এবং নজরুলের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করছি, তখন তুরস্কেও আবার উলটপুরণ ঘটছে। মুস্তাফা কামাল পাশার আধুনিক তুরস্ককে আবার 'ইসলামিক খলিফা'র শাসনের দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন সেদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান এরদোগান। মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন আইএস-এর সঙ্গে এরদোগানের সম্পর্ক, সেই জঙ্গি সংগঠনের সাথে তাঁর পারিবারিক ব্যবসা, তুরস্ক রাষ্ট্রে আবার ধীরে ধীরে ধর্মীয় প্রভাব বাড়ানো, এই সবই গোটা বিশ্বকে চিন্তিত করে রেখেছে।

এই আধুনিক পাকিস্তানি ঐতিহাসিকরা পরিষ্কারই বলছেন, আসলে খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থনের মধ্যেই 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'র এবং মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের বা পাকিস্তানের বীজ লুকিয়েছিল। জিন্না প্রথমে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মেলানোর এই প্রবণতার বিরোধী হলেও পরে নিজেই তার সফল প্রচারক এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'জনক' হয়ে যান।

আজকের অনেক ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকই মনে করেন, গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে যেটা করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বা হিন্দু এবং মুসলমানদের একই পতাকার তলায় এনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, তা হয় নি। তুরস্কে খলিফাকে সরিয়ে মুস্তাফা কামাল পাশার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খিলাফৎ আন্দোলনকারীদের এতটাই হতাশ করেছিল যে প্রধান দুই নেতা, মহম্মদ আলি এবং সওকত আলি আবারও মুসলিম লিগের দিকে ঝুঁকে পড়েন, এবং এই মুসলিম লিগ ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবির দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায়, একদিকে মুলতানে তো অন্যদিকে একেবারে দক্ষিণে মালাবার উপকূলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হতে থাকে। এবং সেটা ১৯২৫ এর মধ্যেই। এই দাঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে যে হতাশাবোধ জাগিয়ে তোলে তা ক্রমশ আলাদা রাষ্ট্রের দাবিকে সোচ্চার করে তোলে।

অহিংস রাজনীতির প্রবক্তা হিসাবে যেমন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তাঁর পথে হেঁটে পরবর্তীকালে মার্কিন মুলুকে মার্টিন লুথার কিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা অবিস্মরণীয় সাফল্য পাবেন, এই সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যের পাশাপাশি এটাও সত্যি হিসাবে থাকবে যে গান্ধী মুসলিম মৌলবাদকে চিনতে ভুল করেছিলেন। সেটা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে'র ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, তেমনই নোয়াখালির দাঙ্গার ক্ষেত্রেও সত্যি। মুসলিম মৌলবাদকে বুঝতে এই ব্যর্থতায় তাঁকে হয়ত খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থনের মতো 'ভুল' সিদ্ধান্তের দিক এগিয়ে দিয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, এবং হয়ত এশিয়ারও সবচেয়ে আলোচ্য রাজনীতির মুসলিম মৌলবাদ বা সামগ্রিকভাবে মুসলিম মনকে বুঝতে কি তাহলে ভুল করেছিল? তিনিই কি তাহলে আসলে বোতলে থাকা দৈত্যকে বাইরে বার করে দিয়েছিলেন? খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতায় কি ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার দৈত্যকে বোতল থেকে বার করে দেয়? আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে এবং আজকের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়েও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা এবং অনেক কিছুর মূল্যায়ন করা জরুরি। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আসাও অবধারিত, ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জোড়ার এবং মৌলবাদকে সামনে নিয়ে আসার 'ভুল' কেন মহাত্মা গান্ধী করেছিলেন? তাহলে কি তিনি, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একজন 'হিন্দু' ছিলেন এবং মুসলিম মনকে চিনে উঠতে পারেন নি?

ইতিহাস এবং রাজনীতি আমাদের সবসময় নতুন নতুন প্রশ্ন তুলতে শেখায় এবং ভাবনার খোরাক জোগায়। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর জীবন এর ব্যতিক্রম হবে কেন?

বামভক্ত বুদ্ধিজীবিরা ইতিহাসকে বদলে দিতে চেয়েছেন, শিক্ষাকে বনবাসে

জয়ন্ত গুহ

ভারতের অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সিপিআই ছেড়ে সিপিআই (এম) দলে যোগ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। স্বাভাবিকভাবেই এনারা কি ইতিহাস খুঁড়ে বার করতে চাইবেন, ১৯৫৩-র আগে সিপিআই-র সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল এবং কীভাবে কত টাকার ডিল হয়েছিল সোভিয়েত গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি-র সঙ্গে? শুধু মিত্রখিন আর্কাইভের বই নয়, এ নিয়ে সিআইএ এবং কেজিবি-র গোপন ফাইলও বহুদিন আগে খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। 'মোগল রাজা' এবং 'মুঘলসরাই' স্টেশনের নাম বদল নিয়ে হইচই করে যদি দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার ইতিহাস থেকে দৃষ্টি সরানো যায়, তাহলে লাভ কাদের বলুন তো!

একসময় কেজিবি আর্কাইভে ভারপ্রাপ্ত ভাসিলি মিত্রখিন-এর লেখা বই এবং ২০০৮-এ কেজিবির অপ্রকাশিত নথি সামনে আসতেই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে নেহরু, ইন্দিরা, সিপিআই এবং সিপিএম-র সম্পর্ক, এমনকি লেনদেনও। স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মান করা। খুব সহজ ব্যাপার নয় সেটা। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য প্রথমে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদারদের মত ঐতিহাসিকদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এবং সেই সিদ্ধান্ত নেবে এমনকিছু 'এলিট' ঐতিহাসিক যাদের রাজনৈতিক অবস্থান সোশ্যালিস্ট এবং মার্কসিস্ট-দের খুব কাছাকাছি। যেমন রোমিলা থাপার, ডি এন ঝাঁ, সতীশ চন্দ্র বা আর এস শর্মা। বলশেভিক বিপ্লবেই যারা আচ্ছন্ন থাকলেন সারাজীবন। যারা আটকে রইলেন ১৯২০-৩০এ। এমনকী সোভিয়েত ঐতিহাসিকরা বেরিয়ে আসতে পারলেও যারা বেরিয়ে আসতে পারেন নি সেই অমোঘ শৃঙ্খল থেকে, তাঁদেরকে নিয়ে ১৯৯৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে অরুণ শৌরি বলেছিলেন, "যদি এনবিটি বা এনসিইআরটি প্রস্তাব পাঠায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'ভারতের ইতিহাস' (ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজ) ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন, তাহলে 'এই পণ্ডিতরা' একমত হয়ে বলতে পারেন, কোনও ভারতীয় ভাষাতেই অনুবাদের যোগ্য নয় এসব। পরিবর্তে তাঁরা সওয়াল করবেন নিজেদের বা ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদ (দ্য গ্রেট হিস্টরিয়ান)-এর কাজ নিয়ে।"

এখানেই শেষ নয়। সরকারি সংস্থা ও পদের অপব্যবহার করে 'বাম-ভক্ত' বুদ্ধিজীবিদের নানা কীর্তির কথা উঠে এসেছে অরুণ শৌরির লেখা 'এমিনেন্ট হিস্টরিয়ানস ঃ দেয়ার টেকনলজি, দেয়ার লাইন, দেয়ার ফ্রড' —বইয়ে। এমনই এক ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অরুণ শৌরি বলছেন, "আইসিএইচআর-এর এক ডেপুটি ডিরেক্টর একটি প্রজেক্ট দিয়েছিলেন ডঃ পরমাত্মা সরন-কে। মধ্যযুগীয় ইতিহাস নিয়ে যাঁর কাজ ভারতবর্ষে বহু প্রশংসিত। অনুবাদ করে তিনি তাঁর কাজ সংস্থায় পাঠিয়েও দেন। ডঃ সরনের মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে সেই ডেপুটি ডিরেক্টর রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন এবং পাণ্ডুলিপির কোনও পরিবর্তন না করে হুবহু বই আকারে প্রকাশিত হয়। নুরুল হাসানকে উৎসর্গ করা সেই বইয়ে ধন্যবাদ জানানো হয়েছিল ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবকে যিনি প্রশংসা করে ফরোয়ার্ড-ও করেছিলেন বইটির।" এরকম জ্যান্ত উদাহরণ কম নেই।

২০১৭ সাল। বিখ্যাত 'মুঘলসরাই' রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তনের সরকারি সিদ্ধান্ত এবং মহারাষ্ট্রে স্কুলের পাঠ্যবই থেকে মুঘল আমলের ইতিহাস অনেকটাই মুছে দেওয়া হল। চিন্তাভাবনা ছিল, মুঘল ইতিহাসের বদলে কংগ্রেস জমানার বফর্স কেলেঙ্কারি, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা এবং মারাঠা বীর শিবাজী মহারাজের কাহিনীই বেশি করে পড়বে পড়ুয়ারা। আর 'মুঘলসরাই'-এর নাম বদলে হবে বিজেপির তাত্ত্বিক নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে। ব্যাস আর যায় কোথায়! রে রে করে মাঠে নেমে পড়লেন রামচন্দ্র গুহ, ইরফান হাবিব, অমর্ত্য সেন সহ 'বাম-ভক্ত' পণ্ডিতরা। এনারা প্রত্যেকেই কিন্তু খুব ভাল জানেন যে, সর্বভারতীয় স্তরে স্থানীয় ইতিহাস সেভাবে জানার অন্য সুযোগ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের দাবি, ইতিহাসে একদম হাত দেওয়া যাবে না। তা সে যতই অসাড় হোক না কেন। মানে মোগল রাজাদের ইতিহাস পড়ব নাকি মোগলদের বিরুদ্ধে অসমের বীর লাচিত বরফুকন-এর বীরগাথা পড়বে পড়ুয়ারা, সেটা ঠিক করে দেবে হাতে গোনা কয়েকজন এলিট 'বাম-ভক্ত' লুটিয়েনস!

নরেন্দ্র মোদী এবং আরএসএস-এর তীব্র সমালোচনা করে রামচন্দ্র গুহ, ইরফান হাবিবরা বলেছিলেন, 'মুঘলসরাই' স্টেশনের নাম বদলে দেশে গৈরিকীকরণের চেষ্টা করছে আরএসএস। কিন্তু সত্যিই কি এমনটা প্রথম হল ভারতবর্ষে? একেবারেই সহমত পোষণ করেন নি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন (২০১৭) ইতিহাস

বিভাগের অধ্যাপিকা তনভীর নাসরিন। তাঁর মতে, "নাম বদল মানেই গেরুয়া করণ নয়... আমি দুটো উদাহরণ দিই, বীরভূমে একটি স্টেশন রয়েছে আহমদপুর, লোকমুখে এটা হয়ে গেছে আমোদপুর। ঠিক তেমনই গুজরাটের আহমেদাবাদও আমাদের বাংলার একটি সংবাদপত্রের দৌলতে হয়ে গিয়েছে আমেদাবাদ। ইতিহাসে কোন নাম টিকে থাকবে আর কোন নাম বিলুপ্ত হবে তা মানুষই ঠিক করবে। এই নাম পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। যে দল যখন ক্ষমতায় এসেছে নিজেদের আদর্শের লোকদের জনসমক্ষে তুলে ধরেতে চেয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলেই বোঝা যাবে প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি চলে আসছে। কয়েকটা জায়গার নাম পরিবর্তন হচ্ছে মানেই যে ভারতবর্ষের গৈরিকীকরণ হয়ে যাচ্ছে, হিন্দুত্ববাদী করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এমনটা নয়। কংগ্রেসের রাজত্বে প্রতিটা বড় শহরে জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধীর নামে রাস্তা রয়েছে। সরকার পরিবর্তনের ফলে বরং নতুন কিছু নাম জানা যাচ্ছে। আগে তো মনেই হত না নেহরু-গান্ধী ছাড়া দেশে আর কোনও কীর্তিমান পুরুষ কিংবা মহিলা জন্মেছেন। হয়ত দেখা গেল আগামী দিনে অন্য সরকার এসে দীনদয়ালের নামটাও পরিবর্তন করে দিলেন।"

একথা যে লুটিয়েনস 'বাম-ভক্ত'-রা বোঝেন না তা নয়। কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালীন যে 'সোশ্যালিস্ট-মার্কসিস্টরা' দুধেভাতে রেখে তাঁদের ব্যবহার করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, সেই তাঁদের দুর্দিনে একটা প্রতিবাদী ন্যারেটিভ তো রাখতেই হবে। আর আমরা? নিতান্তই ছাপোষা বাঙালী মধ্যবিত্ত যারা, তাঁরা কী করব? আমরা তালে তাল মেলাবো বামপন্থী রোমিলা থাপার এবং ইরফান হাবিবদের ইতিহাস নির্মাণে? বিরোধিতা করব না? কিছুতেই জানতে চাইব না, গজনীর মাহমুদ উত্তর-পশ্চিম ভারতকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করে কীভাবে দিল্লি পৌঁছলেন? কেন না ইরফান, রোমিলা থাপাররা এসব জানাতে চান নি। বামপন্থী মত প্রতিষ্ঠায় হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস বড় গণ্ডগোলের বিষয়। আর তাছাড়া 'সেকুলার' ভারতবর্ষে 'হিন্দু' শব্দটা খুব আনস্মার্ট। অসভ্য। কেন না মার্কসিস্ট ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের মতে "হিন্দুরা জামা কাপড় পরতে শিখেছে বিদেশীদের কাছে যারা ভারত শাসন করেছে"। ভারতের অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সিপিআই ছেড়ে সিপিআই (এম) দলে যোগ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। স্বাভাবিকভাবেই এনারা কি ইতিহাস খুঁড়ে বার করতে চাইবেন, ১৯৫৩-র আগে সিপিআই-র সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল এবং কীভাবে কত টাকার ডিল হয়েছিল সোভিয়েত গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি-র সঙ্গে? শুধু মিত্রখিন আর্কাইভের বই নয়, এ নিয়ে সিআইএ এবং কেজিবি-র গোপন ফাইলও বহুদিন আগে খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। 'মোগল রাজা' এবং 'মুঘলসরাই' স্টেশনের নাম বদল নিয়ে হইচই করে যদি দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার ইতিহাস থেকে দৃষ্টি সরানো যায়, তাহলে লাভ কাদের বলুন তো! দেশ ও দেশের মানুষ যদি জানতে চায়, ১৯৬৬ সাল থেকে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, মস্কো কীভাবে অপারেট করত সিপিআই, সিপিএম এবং কংগ্রেসকে! এই সময়েই, দেশের শিক্ষা ও ইতিহাস নির্মাণ নিয়ে নীতি নির্ধারকের ক্ষমতা দখল করে বামপন্থীরা, সোভিয়েত প্লট অনুযায়ী। কিছুই করার ছিল না ইন্দিরা গান্ধীর। ক্ষমতায় আসতে গিয়ে তিনি তখন বামপন্থী তথা কেজিবি-র ইচ্ছানুসারী, সম্ভবত নিরুপায়। দেশের শিক্ষা ও ইতিহাস নিয়ে ছেলেখেলা করেই ক্ষান্ত হন নি বামপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গের নবীন প্রজন্মকে তাঁরা শিক্ষার 'অনিলায়ন' যুগে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যা আদপে একটি ব্লাইন্ড লেন। গোটা বাংলা সেই এক্সিটবিহীন পথের শেষে আটকে গিয়েছে, সেসব নিয়ে নিশ্চয়ই নতুন করে বলবার কিছু নেই!

বাম আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে পার্টিতন্ত্র কীভাবে কায়েম করা হয়েছিল, তার একটা ছবি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অশোক মিত্রের কথা উঠে আসে "আমি ১৯৮৪ সালে হঠাৎ কেন বাম মন্ত্রিসভা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম? আমাকে বলা হল, বেসরকারি কলেজের যাঁরা অধ্যক্ষ, তাঁদের সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সমান বেতন দিতে হবে, তখন আমি ঠিক করলাম, ঢের হয়েছে, আর নয়। তখন নানা বেসরকারি কলেজে এমন অনেক অধ্যক্ষ ছিলেন, যাঁদের যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল না, দলীয় নেতারা তাঁদের সেখানে বসিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে বলা হচ্ছিল, তাঁদের সুশোভন সরকার, তারকনাথ সেন, সুবোধ সেনগুপ্তদের চেয়ে বেশি মাইনে দিতে হবে। আমি বলেছিলাম, 'এটা ঠিক হবে না, আপনারা মুড়িমিছরির দর এক করতে যাবেন না, তাতে দক্ষতা চুলোয় যাবে, আখেরে শিক্ষার সর্বনাশ হবে, সমাজের সর্বনাশ হবে। আপনারা তো গোটা দেশকে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সৎ প্রশাসনের উদাহরণ দেখাতে চান। কিন্তু অন্যায় দূর করতে গিয়ে যদি আপনারা অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেন, তা হলে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?' কিন্তু ওঁরা সেটা শুনতে চাইলেন না।

"পার্টির এ-রকম দুর্দশা হল, তার একটা বড় কারণ, পার্টির সঙ্গে, বিশেষ করে এই রাজ্যের পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, ভারতীয় সংবিধান যা-ই বলুক, পশ্চিমবঙ্গের শাসন থেকে আমাদের কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না, বিপ্লব হোক বা না হোক, এখানে আমরা একতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেছি, সুতরাং বাইরের কারও কথা শোনবার আমাদের দরকার নেই।"

বাম আমলে পাশফেল তুলে দেওয়া, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের চর্বিতচর্বন না করে শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সন্তোষ ভট্টাচার্য-এর অভিজ্ঞতা মনে করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের অবদান। চারের দশকে সন্তোষবাবু অবিভক্ত সিপিআই-এর পূর্ণ সময়ের সদস্য ছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছ'মাস জেলও খেটেছেন। ১৯৬৪ সালে সিপিআই-এ ভাঙন ধরলেও তিনি থেকেছিলেন তাঁর পুরনো দলের সঙ্গেই। বিবাদ চরম আকার নেয় তৎকালীন রাজ্যপাল এ পি শর্মা তিন সদস্যের প্যানেল থেকে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে বেছে নিলে।

প্রথম দিন থেকেই তিনি সিপিএম-এর ছাত্রসংগঠন বা বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের কাছে চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছেন। তাঁর বই 'রেড হ্যামার ওভার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি'র মুখবন্ধে তিনি লিখছেন, "ওরা (সিপিএম) জানত, আমার রাজনৈতিক অতীত এবং মতাদর্শ। সেই সঙ্গে ওরা বুঝেছিল, আমি কোনওদিনই ওদের কথামত চলব না...।" তবে সিপিএমের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু একবারও মাথা নোয়ান নি।

চরম অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে অম্লান দত্তের মত যশস্বী অধ্যাপক-উপাচার্যকেও। এটা যেমন একটা দিক, তেমনই বামজমানায় "কাছের মানুষ" হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, এমনও বহু উদাহরণ রয়েছে। সেই দলে রয়েছেন, ছাত্রজীবনে ছাত্রপরিষদ করা এক ব্যক্তি, যিনি পরে অনিল বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ হয়ে কলকাতার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে হেরে যান অধ্যাপিকা ভারতী মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে (পুরস্কার স্বরূপ!) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয় তাঁকে। আসলে ততদিনে সূচনা হয়েছে অনিলায়নের। এরপরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি বামেদের। সবটাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ।

১০-ই মার্চ ২০১১ মারা যান সন্তোষ ভট্টাচার্য, বাম জমানার আনুষ্ঠানিক অন্তিমলগ্নে। ওনার মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণ করেন ওনার স্ত্রী আরতি ভট্টাচার্য ঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রয়াত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বামফ্রন্ট জমানায় শিক্ষায় দলতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শিকার ছিলেন বোধহয় তিনিই। তবু আজীবন লড়াই করেছেন দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানের পর সে দিনের অকথিত কাহিনি শোনালেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী আরতিদেবী— তিনি ছিলেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের গবেষক। কমিউনিস্ট পার্টিরই অনুগত সদস্য, অথচ, সিপিএম প্রভাবিত কর্মীদের হাতেই বারবার হেনস্তা হতে হয়েছে তাঁকে। সন্তোষবাবুর স্ত্রীও মনে করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে দলতন্ত্র কায়েম করার বিরোধিতা করার জন্য তাঁর ওই পরিণাম হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্জি সত্ত্বেও সন্তোষবাবুর মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেওয়া হয় নি কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে, কারণ পণ করেছিলেন তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াবেন না।

সন্তোষবাবুর স্ত্রীর আক্ষেপ ছিল, আর ক'দিন বেঁচে থাকলে সিপিএম বিদায়ের খবরে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। কিন্তু আজকের দিনে কি দাঁড়িয়ে মনে হয়, সন্তোষবাবু বেঁচে থাকলে শিক্ষাবিদ হিসেবে মোটেও খুশি হতে পারতেন? কারণ আমরা দেখেছি বাম দলতান্ত্রিক ক্ষমতার করাল ছায়া গত এক দশকে শিক্ষাঙ্গনকে গ্রাস করে ফেলেছে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে আসা তৃণমূল শাসনের দাক্ষিণ্যে, ক্ষমতার প্রতিটি অলিন্দে গত দশ বছর ধরে জীবিত রয়েছে বামেদের সেই শ্বাস-প্রশ্বাস।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

দেশ চুরি ?

বিমল লামা

হতবাক মেয়েটা সকাল সকাল এত পুলিশ দেখে। কত গাড়ি এসেছে তাদের সঙ্গে। আর সবাই গিয়ে ঢুকছে ওদের ছোট্ট গ্রামটাতে। আর শোনা যাচ্ছে তার বাবাকেই না কি ধরতে এসেছে সব।

পুলিশের উড়িয়ে যাওয়া ধুলোর মেঘ পেরিয়ে সে-ও এসে ঢোকে গ্রামে। আর দেখে শুধু তার বাবাকে নয়, গোটা গ্রামকেই আসলে ধরতে এসেছে পুলিশ। কিন্তু কেন। কার কী চুরি করল তাদের গ্রাম!

সে তো তখন গ্রামের বাইরে তাদের এক ফালি সবজি ক্ষেতে রাইশাক তুলছিল। সেটাই মা আলু দিয়ে রেঁধে দেবে তার জন্য। আর ভাত দিয়ে তাই খেয়ে সে ইস্কুলে যাবে। ইস্কুলে আজ বাংলা পরীক্ষা। কত কত কষ্টে মুখস্ত করেছে রবিঠাকুরের ক'টা লাইন ঃ—

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে/ জাগোরে ধীরে/ এই ভারতের মহামানবের/ সাগরতীরে।

কিন্তু ওরা এসে সব গোলমাল করে দিল। ওর বাবা আর মা ঘরে যত পুরনো কাগজ আছে সব বার করে ওদের দেখাচ্ছে। পাশের ঘরের হারুকাকাও তাই করছে। তপনজেঠু, সনুমামা, বুড়িপিসি... সব্বাই!

পেঁপে গাছটার গায়ে ঠেস দিয়ে অবাক হয়ে সে দেখে গোটা গ্রামের বড়রাই তাই করছে। যত কাগজ আছে ঘরে..। পুরনো নোংরা ছেঁড়া পচা সব কাগজ দু'হাতে গোছাগোছা ধরে ওদের দেখাতে চাইছে।

কিন্তু ওর মা কাঁদছে কেন। মাকে কাঁদতে দেখলে ওর খুব কষ্ট হয়। কখনও সখনও বাবা মারে মাকে। যখন মদ খেয়ে ঘরে ফেরে। তখন মা একা বসে কাঁদে দেওয়ালের কোণে। ও-ই তো তখন নিজের ছোট ছোট হাতে মুছিয়ে দেয় মায়ের চোখের জল। কিন্তু সে তো ঘরের কথা। গোপন কথা। কিন্তু আজ তো সবার সামনেই কাঁদছে মা। বাবাও কাঁদো কাঁদো। প্রায় সব ঘরেই তো একই অবস্থা। ঘরে ঘরে কাঁদছে বড়রা। কিন্তু ওদের তো কেউ মারে নি। যদিও দেখে মনে হচ্ছে পুলিশগুলো মারধোর করতেই এসেছে। লাঠি বন্দুক নিয়ে। জুতো টুপি পরে।

গোটা গ্রাম জুড়ে অবাক কান্ড। বড়রা ঘরে ঘরে ছোটদের মতো কাঁদছে। ছোটরা অবাক হতবাক হয়ে চুপ করে আছে। মাথামুণ্ডু কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। যেন এক কাগুজে লড়াই লেগেছে গ্রামে। পুলিশের সঙ্গে আসা বাবুরাও কাগজ দেখাচ্ছে। গ্রামের লোকেও কাগজ দেখাচ্ছে পালটা। ওদেরগুলো নতুন চকচকে কাগজ। গ্রামেরগুলো পচা পুরনো ছেঁড়া। ওরা তো জিতবেই এই কাগজের যুদ্ধ।

কাগুজে লড়াই একসময় হাতাহাতিতে গড়িয়ে গেল। কত লোক ঘর ছেড়ে দৌড় দিল বনের দিকে। পিছু ধাওয়া করে কাউকে বা ধরে ফেলল পুলিশ। কেউ পালিয়ে বাঁচল তখনকার মত।

কিন্তু তার বাবা পালালো না। উলটে ঝগড়া করতে গেল পুলিশের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল তার মাকে। কিন্তু ওরা প্রচণ্ড

এক লাথি মেরে চিৎপাত করে ফেলল তার বাবাকে। আর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করল তার মাকে।

ছোট মেয়েটা হাতের শাকগুলো ফেলে ছুটে গেল তার বাবার কাছে। ছোট ছোট দুটো হাতে বাবাকে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল রাস্তার ধুলো থেকে। তখনই কানে এল তার মায়ের তীব্র কান্না চিৎকার। ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়ে দেখল তার মায়ের শাড়ি খুলে গেছে। খোপা খুলে গেছে। মাটিতে থেবড়ে বসে গেছে মা। আর ওরা তিনচার জনে ধরে মাকে একটা কালো গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে।

এবার সে বাবাকে ছেড়ে মায়ের দিকে দৌড়ে যায়। মাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ওদের হাত থেকে। চেষ্টা করে মাকে ওদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু ওরা ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। আর ওর মাকে তুলে ফেলে গাড়ির ভেতর। দরজা বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে। গাড়ির তারজালি দেওয়া জানলায় উঠে আসে মায়ের মুখ। যেন তার মা বিরাট কিছু চুরি করেছে ওদের। তাই ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে শাস্তি দিতে।

তার মা অবশ্য একা নয়। গ্রামের অর্ধেক লোককেই ওরা ধরতে চেষ্টা করছে। অনেকেই পালিয়েছে ঘর ছেড়ে। বৌ-বাচ্চা ছেড়ে। অনেকে আবার ধরাও পড়েছে তার মায়ের মত। এমনকি তার মত ছোটদেরও ধরেছে কয়েক জনকে। কিন্তু তাকে ধরে নি। তার বাবাকেও না।

কিন্তু সে-ও তো চোর। আম পেয়ারা আচার কুল... কত কী সে চুরি করেছে। কিন্তু তাকে ওরা ধরল না। তাহলে তার মা এমন কী চুরি করল যে ওরা মাকে ধরে নিয়ে গেল!

ওদের গাড়িগুলো চলে যাবার পর গোটা গ্রাম থমথমে। কেউ কাঁদছে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কেউ মাটিতে পড়ে আছে মড়ার মত। তার বাবাকে ওরা যেখানে ফেলেছিল লাথি মেরে সেখানেই পড়ে আছে এখনও।

তার রাইশাকগুলোও ছড়িয়ে পড়ে আছে ধুলোর ওপর। জুতো পায়ে মাড়িয়েও দিয়েছে ওরা। তবু সে হাঁটুমুড়ে বসে ছড়ানো শাকের পাশে। একটা একটা করে কুড়িয়ে জড়ো করে আবার। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর। যেন সে কোনও পরম ধন। যতই যাইহোক রাইশাককে যেন বাঁচাতেই হবে। তার মা থাক বা না থাক তার বাবার তো খিদে পাবেই সময় হলে। সেকথা সে জানে। যতই বড় অশান্তি হোক খিদের সময় খিদে আসে। ঘুমের সময়ঘুম। তেষ্টার সময় আসে তেষ্টা।

তাই সে শাকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরে বারান্দায় চারিদিকে ছড়ানো কাগজপত্র। কিছু সে চেনে— রেশনকার্ড, আধারকার্ড, ভোটেরকার্ড...। কিছু আবার অচেনা কাগজ। নিশ্চয়ই দরকারি হবে সব। তাই সে আবার হাঁটু মুড়ে বসে কাগজগুলোর পাশে। একটা একটা করে কুড়িয়ে নেয় ছোট ছোট হাতে।

উনুনের কাঠ নিভে গেছে কখন। ভাতের কালো ডেচকিটা চাপানো আছে। তার জল শুকিয়ে আধপোড়া ভাত শক্ত হয়ে গেছে। তারই পাশে সে রেখেছে রাইশাকগুলো। তার পাশে সযত্নে সে

নামিয়ে রাখে দরকারি কাগজগুলো।

ঘরের কোণে সবুজ সাদা ফুল আঁকা টিনের বাক্স। সেই বাক্সে সব সময় তালা ঝোলে। কারণ যা কিছু মূল্যবান, সবই থাকে ওই বাক্সে। থাকে মায়ের শাড়ি জামাকাপড়। তারও একটা দুটো জামা সোয়েটার। বাবার...। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে আজ। ছোট মেয়েটা হাঁটু মুড়ে বসে বাক্সের পাশে। একে একে গুছিয়ে রাখে সব। দরকারি কাগজগুলো ওতো সব বাক্সেই থাকত। তাই সেগুলো ও সে তুলে রেখে দেয় বাক্সের ভেতর। তারপর বাক্সে তালা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

প্লাস্টিকের হলুদ জেরিকেনে জল। সে-ই তো নিয়ে এসেছে সকালে পিঠে নামলো দড়ি বেঁধে। সেই কোন তিস্তা নদীর কাছে বোক্সি ধারা থেকে। যেতে আসতে এক ঘণ্টা লেগে যায়। সেই জলে ভাত চড়িয়ে ছিল তার মা। এখনও আধভর্তি আছে জল। সেই জল প্লাস্টিকের মগে ঢালে মেয়েটা। মগ থেকে ঢালে বোতলে। তারপর বোতলের নীল ছিপি ঘুরিয়ে বন্ধ করতে করতে বেরিয়ে আসে বাইরে।

তার বাবা তখনও চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে ধুলোর ওপর। চেয়ে আছে আকাশের দিকে। পলক পড়ছে না চোখের।

মেয়েটা কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। হাঁটুমুড়ে বসে বাবার পাশে। বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "বাবা, জল খাও!"

ওর বাবা ধীরে ধীরে উঠে বসে। বোতলটা নিয়ে জল খায়। কোনও কথা বলে না। বসেই থাকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

বাবার পাশে মাটিতে থেবড়ে বসে সে-ও। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে থাকে বাবার হাত। অনেক্ষণ পর সে জিজ্ঞেস করে, "মাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল কেন বাবা? মা কি কিছু চুরি করেছে?"

বাবা মুখে কিছু বলে না। শুধু মাথা নেড়ে সায় দেয়। মেয়েটা ভীষণ অবাক হয়ে যায় শুনে যে তার মা চুরি করেছে। সে বিশ্বাসই করতে পারে না। তাই সে আবার ধীরে ধীরে বলে, "মা কী চুরি করেছে বাবা?"

এবার তার বাবা মুখ তুলে চায়। সোজাসুজি তাকায় তার দিকে। আর মাথা নেড়ে বলে, "দেশ!"

মেয়ে আরও হতবাক হয়ে বলে, "দেশ?"

বাবা বলে, "হ্যাঁ, তোর মা দেশ চুরি করেছে।"

কী জানি কী বোঝে মেয়েটা! চুপ করে থাকে অনেক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করে, "কার দেশ?"

বাবা বলে, "সেটাই তো বুঝতে পারছি নারে মা। কার দেশ কে চুরি করেছে সেটাই বুঝতে পারছি না।"

মেয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে বলে, "তাহলে কী হবে?"

বাবা মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলে, "এবার আমি আসল চোরকে ধরতে বেরব। তুই তো বড় হয়ে গেছিস। পারবি না একা থাকতে?"

মেয়ে খুশি হয়ে বলে, "আসল চোরকে ধরে মাকে ফিরিয়ে আনবে তো?"

বাবা হঠাৎ মেয়েকে বুকে টেনে নেয়। তার মাথায় চুমু দিয়ে বলে, "তোর মাথার দিব্যি, আমি আত্মঘাতী হয়ে হলেও তোর মাকে ফিরিয়ে আনব। এই আমার অঙ্গীকার তোর কাছে। তোর প্রজন্মের কাছে।!"

রাজনগরের রাজনীতি

রাজনীতিতে রাজনগর কোচবিহার আগাগোড়াই স্বতন্ত্র। রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে অবতরণের পর দীর্ঘ সাত দশকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, গণ আন্দোলনের ঘটনাবলি, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সবটাই বড় আকর্ষণীয়, বর্ণময়। রাজ আমলে ৪৬-এর ছাত্র আন্দোলন, হিতসাধনী আন্দোলন, থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতে ৫১-র খাদ্য আন্দোলন, ৭১-এর নকশাল আন্দোলন, ৭৪-এর ছাত্র বিক্ষোভ, ৮৮-র যুব আন্দোলন, উতজাস, কেপিপি আন্দোলন, ঐতিহাসিক তিনবিঘা আন্দোলন, গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন পর্যন্ত উঠে আসবে তার লেখায়। এ ছাড়াও রাজনৈতিক নেতাদের ভাষ্য ও সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে উঠে আসবে এই প্রত্যন্ত এলাকার অজানা অনেক ঘটনাবলি। দীর্ঘ চার দশক ধরে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্র পত্রিকায় লেখালেখির অভিজ্ঞতা লব্ধ নানা ঘটনা তুলে ধরবেন তিনি এই প্রতিবেদনে।

'এখন ডুয়ার্স'-এর জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে সাংবাদিক **অরবিন্দ ভট্টাচার্যের** ধারাবাহিক প্রতিবেদন **'রাজনগরের রাজনীতি'** প্রকাশিত হবে। রাজন্য শাসিত কোচবিহারের ভারত ভুক্তির পর থেকে উত্তরের এই প্রান্তভূমির রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ উঠে আসবে এই প্রতিবেদনে।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page
Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

কবির কলমে

সাহুনদী ও আশ্চর্য বনপ্রদীপ

সুভান

শিলিগুড়ি শহরের তরুণ কবিদের নতুন আস্তানা এই জীর্ণ একটা নদীর পার। নাম সাহুনদী। পিছনেই ঘনজঙ্গল। সামনে শহর যা কিনা ক্রমশ আগুন ছড়াতে থাকা জনারণ্যের দাবানল হয়ে গেছে। সাহুনদীর পার ঘেঁষা এই অঞ্চলটির আসল নাম হচ্ছে থারোঘাটি। খুব কম মানুষই জানে এই নাম। লোকমুখে ফারাবাড়ি ব্রীজ বেশি পরিচিত। পাশেই রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল, ডাবগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জার অফিস।পুরনো কাঠের ব্রীজের ভগ্নাবশেষ। শহরের মানুষের কাছে এই স্থান শহরের প্রান্তিক একটা জংলি জায়গা হলেও শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা, বাংলার তরুণ কবিরা এই জায়গাটিকে শুধুই সাহু বলে চেনে। বাংলা কবিতার মূল স্রোতে কবে যে সাহু অক্ষরের মধ্যেও বয়ে যেতে শুরু করল এখন ভাবলে বেশ অবাক লাগে, কলকাতার তরুণ কবি ছন্দম মুখোপাধ্যায় হোক কিংবা বাংলার জনপ্রিয় কবি সুজিত দাস, সকলেই একবার হলেও সাহুতে সময় কাটিয়ে এসেছে। সাহুর প্রেমে পড়লে তাই বিচ্ছেদ নেই।

পরিবেশগত দিক থেকেও সাহুই বাঁচিয়ে রেখেছে শিলিগুড়ির কালোবাতাসকে। মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসকে। শহরের এই ফুসফুস শহরের বাইরে অবস্থান করে। সাহু একটা নাম নয়, একটা অনুভূতি। রুক্ষ শীত যখন সাহুর সমস্ত পাতা ঝরিয়ে ফেলতে চায়, ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া নাড়ে নতুন বসন্ত। একটা পাতা একটা নতুন শুরুর নাম। জঙ্গলের কিনারা বরাবর জারুলের বিচ্ছিন্ন কিছু গাছও আছে। ঋতুর বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহুর রঙ, শরীরও পুরুষ বদলাতেই থাকে। তবুও নদীর পার জুড়ে পড়ে থাকে বিষণ্ন নেশাভাঙা কাচের টুকরো। আস্থার নগ্নকঙ্কাল। সনাতন কাঠামোর নিচে নদীর ধর্ম চাপা পড়ে থাকে। অথচ শহরের লোকেরা জানেই না এই সাহুর পার ঘেঁষা জঙ্গলের ভেতরেই রয়েছে এক আশ্চর্য পুকুর। যার নাম ঠান্ডা পুকুর। স্থানীয় ছেলেরা স্নান করতে যায় বিপদজনক জঙ্গল ভেদ করে। এই পুকুরের জল হিমঠান্ডা। শান্ত। রহস্যজনক ভাবে একা ও ভয়াবহ। একদিন এই অঞ্চলই ছিল হাতিদের চারণভূমি। আজও কদাচিৎ হাতির পাল চলে আসে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন ভাবে নদীর ওপারে। কিন্তু এখন এখানেও মানব মনোপলি। নেপালি বস্তির গা ঘেঁষে গজিয়ে উঠছে নানান আলোয় মোড়া বৃন্দাবন মথুরা শানাই রিসর্ট। বিবাহবাসর। জন্মঘর। আনন্দ বেজে উঠছে অস্পষ্ট সূর্যাস্তের পর। পুনরায় নতুন দিনের নতুন আলোর রশ্মির সাথে। কত রাত জাগা তারা অন্য পাড়ায় চাঁদ দেখার বাহানায় গলে গলে পড়ে গেল বৈকুণ্ঠপুরের সবুজ সাঁঝবাতিতে আর ভোরের অল্প আলো ফুটতে না ফুটতেই আরও বেশি আলো, এই জলের কাছে হাঁটু গেঁড়ে মিনতি করে আশ্রম হও। আশ্রমিক হই। কুটির করে ঘুমিয়ে পড়ি রাত্রির কোলে।

সাহু, নামটা শুনলেই কেমন সাধু শব্দের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই। সন্ত হয়ে ওঠে বায়ুস্পর্শ। সাহুর কাছে গেলে তাই মনে হয় যেন সাধুসঙ্গ পেয়েছি। জীবনের আখড়ায় এসেছি। আমার সাধন ও যাপন মিলেমিশে যায় এই ক্ষীণকায় নদীর কিনারে এসে। জীবন তো বাউলের মতো ঘুরে বেড়ায়। ঘর নেই। সংসার নেই। শুধু গান আর ভজ মানব ধর্মের কথা। সাহু শহরের বাইরে একমাত্র বিশ্রামঘর। আরামকেদারাও বলা যায়। এই সাধন ও সঙ্গিনীর ভেতর প্রবেশ করতে করতে দেহ আরও চওড়া হয়ে যায়যেন নদী। সাহুর মতো, সাধুসঙ্গের মতো। বৈরাগ্য নয়। ভবঘুরেও নয়। মায়া আর ত্যাগের মাঝে আটকে পড়ে থাকা ভাঙা সংসারীও নয়। একটা জঙ্গল দিয়ে ঘেরা নদী, যার জল কমতে কমতে হাঁটু ডুবে এলে বায়ু ফুরিয়ে আসে। নদীর পারে আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা করে চিতার আগুন টুকু নিভে যাওয়ার। সকলের দেখার আড়ালেই এই জীবনচক্র ঘুরেই চলেছে এই গোপন এই পুণ্যভূমিতে। মৃতের ছাইভস্ম এই অনন্ত বৃক্ষরাশির চরণে পিতৃঋণ হিসেবে যেন অর্পন করে দেওয়া, হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া সুদক্ষিণা হাওয়া। নতুন প্রাণ তাই নদীর কোমল বাঁকে-বাঁকে এসে ধরা দেয়। স্থানীয় ছেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরে, দূরে গাছের ওপর তীক্ষ্ণ নজরে মাছরাঙাটিও অপেক্ষায় বসে থাকে পরের শিকারের। নদীজঙ্গল ঘেঁষা এই খোলা মাঠ প্রান্তরে রোগা গোরু গুলোকে ঘাস খেতে দেখলেই আমার রাখাল ছেলের কথাই মনে পড়ে। মনে হয়েই বুঝি সন্ধে হল। তার পিছু পিছু বাঘের ভয়।

মাঝে মাঝে সাহুর পার খুব বিষাদময় লাগে। একাই আসি। এলে বোঝা যায় আয়ু বুঝি কর্মের কাছে খুব দ্রুত ফুরিয়ে এলো। কত কি করা হল না, বলা হল না, কত নতুনকে ভালবাসা হল না, কত পুরাতন প্রেম আজও ভালবাসাহীন। সামনেই শীতকাল। মায়াময় উত্তুরে হাওয়া ঢুকে পড়েছে শিলিগুড়ি শহরে। শহরের মাঝবরাবর বয়ে গেছে মহানন্দা। অথচ তার পারে শুধুই গড়ে উঠেছে নরক যন্ত্রণা। অবৈধ সম্পর্ক। জঞ্জালের আয়না। মইষালবাড়ি। শহুরে শ্মশান। কিন্তু আমার মন কিন্তু পড়ে থাকে শহরের ঠিক বাইরে উপেক্ষিত সাহুর পারে। শীতের এই বিষণ্ন কুয়াশায় নদীর পারে সাদাবকের সংসার বসে। আমি এইসব কিছুই খুব দূর থেকে দেখি আর উপভোগ করি। সাহু আমার কাছে জীবন দেখার ওয়াচ টাওয়ার। এই তো সেদিন বসে ছিলাম। গোঁসাই দু-কাপ লাল চা এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি আমার দোতারার তারে ডাং দিচ্ছি। একটি নেপালি ছেলে এসে শুনতে চাইল। আমি দোতারার নতুন নবীশ। বেশি কিছু শিখি নি। একাকী নিভৃতে নিজেকে জীবন গেয়ে শোনাই। অথচ ছেলেটি নির্ভুল ভাবে তার জীবনের গল্পটুকু শুনিয়ে কোথায় যে চলে গেল। পেশায় গাড়িচালক। নেপালি ফোক গান করে। তাই আমার হাতের যন্ত্রটি তার চেনা। যেমন আমার কাছে তার জীবনের গল্পটাও খুব চেনা। আসলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই নদীর মতো। সদা প্রবহমান। এমনই দুপুর বেলায় চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতেই এক অন্য আঞ্চলিক ভাষার টান গলায় নিয়ে পিছন থেকে বলে উঠল কেউ, মোয়া নেবেন? জয়নগরের স্পেশাল মোয়া? মোগরা থেকে এসেছি। প্রচার ও ব্যবসার জন্য, সুদূর দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে। তা শহর ছেড়ে এই জঙ্গল ঘেঁষা অঞ্চলে কেন? প্রশ্ন করলাম। উত্তরে সে বলল ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। কিন্তু এই ব্রীজটা পেরিয়ে আর বসতি দেখলাম না। কিছু মানুষ যদিও নেপালি বস্তিতে থাকে। কিন্তু আমি ওই ভাষা বুইজতে পারি না। সত্যি তো আমরা কত মানুষের ভাষা বুঝতে পারি না। কত মানুষের মনের ভাষা ধরতে পারি না। কত প্রেম আমাদের বাকি থেকে যায় ভাষাটুকু না বোঝার জন্য। কত অভিমান মিটিয়ে নিতে পারি না। কিন্তু সাহুনদীও কী অন্যের ভাষা বুঝতে পারে না? এই যে এত ধরনের মানুষ এসে এখানে আড্ডা দেয় এখান থেকে আগামীর চিন্তাবীজ নিয়ে যায় সঙ্গে করে। এই যে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের ভেতর সাহু খুব নিঃশব্দে প্রবেশ করে যায় ডিসেম্বরের শীতের মতো। কেউ তো বুঝতেও পারে না। সাহুনদীকে ঘিরেই যখন শহরের ভোর হয়, নরেশ মোড় থেকে পাপিয়াপাড়ার টিলের চাল দেওয়া বাড়ি উঠোনে মা ও মেয়েরা ঘরসাজায়, যখন সাহুর পারে নিরালা দুপুর একা হয়ে ওঠে একা প্রেমিকের মতো অথবা সন্ধে নেমে আসে,মনে হয় সমস্ত বিষণ্ণতা এসে এই সাহুর পারেই কে বা কারা ফেলে দিয়ে গেছে। অথচ সাহুর বুকে কোথাও একটাও পাথর নেই। শুধু নরম সাদা বালি। শুধুই ঝরে ঝরে পড়া। ধরব ধরব করেও যা ধরা যায় না দুহাতের মুঠোয়।

সাহুর পারে বিগত ৭ বছরে অনেকবার পূর্ণিমার

চাঁদ দেখতে এসেছি। যারা বোকার মতো চাঁদ দেখতে ভালোবাসে, যারা চাঁদের আলোয় দু হাত পেতে আলো ধরতে চায়। জোনাকির মতো উড়ে যায় কমজোর ডানা মেলে। সেই সমস্ত উন্মাদদের মতো আমিও বহুবার জঙ্গলের কালোছায়ার ফাঁক দিয়ে ঢলে পড়া জ্যোৎস্নার আলো কুড়োতে ঢুকে পড়েছি সেই আশ্চর্য বনপ্রদীপের ভেতর। কখনও তিনজন তরুণ ও সাহুর গল্প লিখেছি রাত্রি প্রথম প্রহরে। কখনও বা চাঁদের আলোয় কবিতার মত নিজস্ব প্রলাপ বিড়বিড় করে গেছি। চাঁদের আলো শাল জঙ্গলের ঘন ডালপাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে এক অদ্ভুত আলোআঁধারির দৃশ্য তৈরি করে। যেন দালির পেন্টিং। চাঁদ গলে গলে পড়ছে ডিসেম্বরের সাহুর জলে। রূপালি জল নিমেষে যেন রুহানী হয়ে উঠছে। আবার বর্ষার সাহু একেবারে অন্যরকম। যেন নদী থেকে সদ্য স্নান সেরে ভিজে গায়ে ষোড়শী কিশোরী গহীনবনের ভেতর দিয়ে বনবস্তিতে ঢুকে যাচ্ছে। গাছের পাতায় তুমুল বৃষ্টির আওয়াজ সিম্ফনির মতো বাজতেই থাকে গাছে গাছে। আবার এই সাহুই কৃষ্ণপক্ষে নিতাই সেজে অষ্টপ্রহর কীর্তন গেয়ে ওঠে। চন্দ্র পক্ষে একই অঙ্গে রাধার মতো হায় কৃষ্ণ কেঁদে মরে জঙ্গলে জঙ্গলে। এসব আসলেই কবির কল্পনায় সাহুকে দেখা। কিন্তু সে আসলেই এক মায়াবী নারীর মতো। যে ছল জানে। ভ্রম তৈরি করতে জানে। নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়ে দিতে জানে। মায়ায় জড়িয়ে ফেলতে জানে। এই মায়ার বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসা কোনও কবির পক্ষে কিংবা খুনির পক্ষেও অসম্ভব। কারণ সাহু দুইজনকেই আশ্রয় দেয়, সমান ভালবাসে।

এই উত্তরের ভূমি থেকেই এক আগুন সময়ের জন্ম হয়েছিল। সে আগুন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় যদি সত্তরের সেই উত্তাল সময় জেগে উঠত, নিঃসন্দেহে তাদের কোর কমিটির মিটিং এই সাহুনদীর তীরে হত, গোঁসাইয়ের চায়ের দোকানে হত? যদি হাংরি আন্দোলনের মৃত কবিরা বেঁচে উঠত পুনরায়, কবিতায় সেঁটে দিত স্বেচ্ছাচার, সাহু নিশ্চিতভাবে তাদের একমাত্র আঁতুড়ঘর হত। গোঁসাইয়ের চায়ের দোকান থেকেই বিলি করা হত নতুন দিনের ইস্তেহার। ফাল্গুনী রায় কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতার নেশায় মাতাল হয়ে পড়ে থাকতই সাহুর পার ঘেঁষে। আমরাও কোথাও সাহুর কাছে এসে এমনই এক ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়ি যেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। এ যেন চক্রব্যূহ যার ভেতরে প্রবেশ করার মন্ত্র তো জানা কিন্তু বেরিয়ে আসার মন্ত্র জানা নেই।

প্রেমের নতুন শুরু অথবা প্রেমের পার ভাঙার যন্ত্রণা সাহুর থেকে ভালো কেই বা জানবে! মন্দিরের দিকে নদীপারের গাছগুলো আসলে একটা ভাসমান শূন্য উদ্যান। হাওয়ায় ভেসে থাকা গাছের শেকড় গুলো দেখে মাঝে-মাঝে প্রেম হারানো কবির জীবন মনে হয়। মাটিহীন গাছের মতো কবিও প্রেমহীন হয়ে এলে সাহুর কাছেই ফিরে আসে। কবিদের সঙ্গে সাহুনদীর এই যে গোপন সঙ্গম, এই পরকীয়া বা স্বকীয়াই বলি, এই দেহসাধনার মধ্যে দিয়েই যেন একটা একটা শালগাছ বাউল হয়ে ওঠে। এই হাজার হাজার শাল গাছের মাঝে, ঠিক মাঝখানে সাহুতে একটি মাত্র পলাশ গাছ আছে। যেন হাজার বাউলের একটি মাত্র সাধনসঙ্গিনী। মিলন হবে কত দিনে জানা নেই।

উত্তরের উপকথা

চৈতি ছট

ডালপট্টির টিকি বরাবর কম্‌লাভাবির কাচের চুড়ির দোকান। বিশেষ বিশেষ পার্বণে চুড়ির সঙ্গে লাল চুনরি, নারকেল, ডালি-কুলো, মেটে সিঁদুর, জরি ধাগার পণ্যসম্ভারে পূর্ণগর্ভা হয়ে ওঠে সে বিপণী। তবে হিন্দু ক্যালেন্ডারে চৈত্রমাস পড়লে দিন কম্‌লাভাবির ব্যবসা বন্ধ থাকে আর ইংরিজির নভেম্বর মাসে পরপর তিনদিন ধরে চলে মাইকের গান,দোকানখানা সাজে টুনিবালবের ঝালর আর কলাগাছের মাঙ্গলিক সজ্জায়।

কেন?

ছটি মাইয়ার উপোস।

ছট অর্থাৎ সূর্যষষ্ঠী সর্বশুদ্ধভাবে অবাঙালী ব্রতপার্বণ। কিন্তু লোকধর্ম কবেই বা মানচিত্র মেনেছে বলুন! আজকাল বং-ঘরণীরাও অবলীলায় ছটের উপোস করছেন, ফুল ফল কাপড় প্রদীপ নারকেলের অর্ঘ্য হাতে নিয়ে দিব্যি নেমে যাচ্ছেন নদীর বুকজলে।

লোককথাটি পেয়েছিলাম বারাণসীর এক পরিচিতার কাছে। কমলাভাবির কাছে যাচাই করতে গিয়ে দেখেছি দু'একটি তথ্য এদিক ওদিক ছাড়া আর কোনও বিশেষ তফাত নেই। এদিক ওদিক হওয়াই স্বাভাবিক। সেই সুদূর বরুণা-অসি-উলটগঙ্গা থেকে তিস্তা-তোর্ষা-সঙ্কোশ অবধি যে গল্প বয়ে বয়ে এল, তার বয়ানে অদলবদলের ঢেউ থাকবে না? বিলক্ষণ থাকবে।

গল্পটি লম্বা। কাজেই ভূমিকা আর দীর্ঘ করা যাবে না। শুধু একটি কথা না বললেই নয়। বাঙালি হোন বা অবাঙালি,ষষ্ঠীর কল্যাণে গ্লোবাল গিন্নিদের হেঁশেলে ঠেকুয়া নামে যে অমৃতখাদ্য তৈরি হয় তাতে ধন্য দিতে ইচ্ছ করে সনাতন হিন্দুয়ানাকে। অকারণে জাতের মুলুকের ভাষার চুলোচুলি করে রসনাকে বঞ্চিত করব? বালাই ষাট!

বরং গল্পটা বলি।

উদিত সূর্য আর অস্তগামী সূর্যের স্ত্রী উষা আর প্রত্যুষার পুজো করছিল পুজারিণীর দল। কার্তিকের শুক্লপক্ষ, ষষ্ঠ তিথির পুণ্যে যেঠের বাছা কোলে আসবে এই কামনায়। তাই দেখে এক স্ত্রীলোক মনপ্রাণ ঢেলে মানত করলো, আমার যদি ছেলে হয় তবে ছটিমাতার পুজো করব। তার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন দিবাকর। কিন্তু ধিক্‌ মনুষ্য চরিত্র! বহু অপেক্ষার পর ছেলে কোলে পেয়ে স্ত্রীলোকটি তার মানতের কথা বেমালুম ভুলে গেল।

দেখতে দেখতে উপযুক্ত হলো ছেলে। বাপ-মা খুঁজে পেতে পাত্রী জোগাড় করে মহা ধুমধামে ছেলেকে বিয়ে করতে পাঠালেন। যথারীতি বিয়ে হয়ে গেলে চার কাহারের পালকি চেপে নতুন বউ রওনা দিল শ্বশুরবাড়ি। ছেলেও চলল পিছে পিছে।

মাঝপথে পড়ল ঘন বন। এদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। বন পার হতে রাত হয়ে যাবে চিন্তা করে ছেলে হুকুম দিল পালকি এখানেই রাখো। কাল সকালে বন পার হব।

কাহারেরা পালকি নামিয়ে কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে বিশ্রাম করতে বসল। ছেলেও বউয়ের গা ঘেঁসে এটা ওটা আলাপ জুড়ল।

হঠাৎ কী হল, ছেলেটির মাথা ঝিমঝিম, পেটে পিঠে অস্বস্তি, দেখতে না দেখতে সে প্রাণ হারিয়ে বউয়ের কোলে ঢলে পড়ল। বউ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, কাহারের দল সেবা শুশ্রূষার চেষ্টা করল, কীসের কী। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে।

মাত্র এক রাতেই সোহাগ উজড়ে গেল, হায় হায় করে উঠল নতুন বউ। এখন কোন মুখে বাপের বাড়ি ফিরবে, কোন মুখেই বা শ্বশুরবাড়ি যাবে, দু'হাতে বরকে জড়িয়ে ধরে সে বুকফাটা স্বরে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ লাঠির ঠুকঠুক আওয়াজ। চমকে মুখ তুলল বউ! দেখে কোত্থেকে এক বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। পরনে সাদা থান, কোমর উঠেছে আকাশপানে, মুন্ডুটা যেন কাশবন। এত রাতে নির্জন জঙ্গলে এ বুড়ি কোত্থেকে এলো? আশেপাশে জনমানবের চিহ্নও নেই। বউ ভয়ে ভয়ে ভাবছে, চুরেল-টুরেল নয়তো? কিন্তু বউয়ের সন্দেহ মুছে দিয়ে বুড়ি নিজেই বলল, আমি ছটমাতা। তোমার স্বামীর জন্মের আগে তোমার শ্বাশুড়ি মানত করেছিল ছেলে হলে আমার পুজো করবে। করে নি। তুমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাকে বলে দিও, তার পাপেই ছেলে মরেছে।

বউটি বেশ বুদ্ধিমতী। এত বিপদেও ঘাবড়ে না গিয়ে চোখের জল মুছে মিনতি করে বলল, তুমি মা দোষীকে সাজা দিয়েছ কিন্তু আমি একথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে? উল্টে আমাকেই রাক্ষসী ঠাওরাবে। তার চেয়ে বরং আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও, আমি বাড়ি গিয়ে শ্বাশুড়িকে বলব তোমার পুজো করতে। যদি তিনি না করেন তখন না হয় তাঁর ছেলের প্রাণ নিও।

ছটমাতা রাজি হলেন। তাঁর আশীর্বাদে নতুন বউয়ের স্বামী বেঁচে উঠল। আনন্দে ডগমগ নতুন বউ শ্বশুরবাড়ি গিয়েই আলাদা করে শ্বাশুড়িকে ডেকে আসার পথে যা যা হয়েছে সব খুলে বলল। শ্বাশুড়ি শুনে মনে মনে ভাবল, আমি মানত করছি একথা বউ জানল কী করে, তবে তো সত্যিই ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু এখন ভরা চৈত্র মাস। ছট পুজো করতে হয় কার্তিকে।

বিয়েবাড়ির আর পাঁচ কুটুমের মধ্যেও কথাটা ছড়িয়ে গেছিল। সবাই বলল তাতে কী। ফর্সাপক্ষের ষষ্ঠীতিথি দেখে পুজো করো, দোষ হবে না। সন্তানের জন্য সব করা যায়।

ওদিকে, সত্যিই সেবার চৈত্রমাসে এমন খরা, মাঠের ফসল মাঠেই শুকোচ্ছে। ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হচ্ছেন মা অন্নপূর্ণা। সূর্যের তাপ কমাবার জন্য তিনিও ধ্যানে বসেছেন। দেবলোকে তোলপাড় লেগেছে। বিপদ বুঝে হাত বাড়ালেন মা গঙ্গা। অন্নপূর্ণাকে বুকে নিয়ে তিনি সূর্যদেবতার বারোটি নাম স্তব করলেন। দেখতে দেখতে অন্নপূর্ণার শ্রী ফিরল, সতেজ সরস হলো পৃথিবী, ক্ষেতের ফসল বাঁচল আবার এক মায়ের কোলও ভরল।

সেই থেকে কার্তিকের সঙ্গে চৈত্রমাসেও ছট পুজো হয়ে আসছে। তবে তার নাম চৈতি ছট।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

ডুয়ার্সের চার্চগুলিতে প্রাক বড়দিন সুহানা সফর

গৌতম চক্রবর্তী

দ্বিচক্রযানে ডুয়ার্সের চার্চ পর্যটন খানিক গড়িমসি করে হলেও ডুয়ার্সে শীত এসে পড়েছে। ঘন কুয়াশা ভিনদেশী দস্যুদের মতোই ঘিরে ফেলছে গ্রাম এবং শহর। শীত মানেই আসছে বড়দিন। শহরের মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বড়দিন পালন করে কেক খেয়ে। যদিও সবাই গির্জাতে যায় না। ডিসেম্বরের এই শীতের মরশুমে পবিত্র বড়দিন পালন করার প্রাকমুহূর্তে চারিদিকেই উৎসবের মেজাজ। বন-জঙ্গল এবং পাহাড়ি সবুজে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে অরণ্যের কোলে বিচরণ করে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতির মানুষ যাদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। সবুজে ঘেরা ডুয়ার্সে কোথায় কোথায় চার্চগুলি রয়েছে এবং কী ভাবে তারা কাজ করে তা সরেজমিনে নিজের চোখে দেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার চোখ কপালে উঠে গেল। দ্বিশতাধিক ছোট বড় চার্চ। তাদের বহুবিচিত্র কার্যাবলী। খ্রীষ্টধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও মানবসেবার দিকটিকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই কৌশিকের দ্বিচক্রযানের শরণাপন্ন হলাম। কারণ দ্বিচক্রযান ছাড়া ডুয়ার্সের জলপাইগুড়ি জেলার চার্চগুলিকে এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি, মাদারিহাট, মেন্দাবাড়ি, বীরপাড়া এবং জয়গাঁ পৌঁছাতেই পারব না। কারণ বেশিরভাগ চার্চ চা বাগান এবং জঙ্গলমহল অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিবাসী এবং জনজাতি মহল্লায়। তাই গুগল ম্যাপ থেকে রুট প্ল্যানিং করে বেড়িয়ে পড়লাম সুহানা সফরে।

জলপাইগুড়ি সার্কিট

জলপাইগুড়ি শহরের কালেক্টরেট এভিনিউ এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা জলপাইগুড়ির সেন্ট মাইকেল এন্ড এঞ্জেলস চার্চ ১৫০ বছরের পুরনো গির্জা। এটি একটি অন্যতম প্রাচীন গির্জা। রোমান ক্যাথলিক গির্জাটি ১৮৬৪ সালে তৈরি হয়েছিল। জলপাইগুড়ির সেন্ট মাইকেল এন্ড এঞ্জেলস চার্চ হেরিটেজ কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায়। ১৮৬৪ সালের ঠিক কোনদিন এই চার্চটি স্থাপন করা হয়েছিল সে বিষয়ে চার্চ কর্মকর্তারা নিশ্চিত নন বলে বড়দিনকেই তারা জন্মবার্ষিকী হিসাবে পালন করেন। কোন মাসে এবং কোন দিনে এই গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চার্চ সেটি জানাতে পারে নি কারণ গির্জাটি উদ্বোধনের সময় স্থাপন করা মার্বেল ফলকটি ১৯৬৮ সালে স্থাপিত হয়। ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময়ে যখন প্রায় পুরো জলপাইগুড়ি শহর জলের তলায় ছিল সেইসময় এটি প্রোথিত হয়। গির্জার ১৫০ বছর উদযাপনের সময় খনন করে ফলকটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সফল হওয়া যায়নি। পুরনো নথি থেকে এই গির্জাটির স্থাপনকাল সম্পর্কে জানা গেছে। চার্চটি চুন সুড়কি এবং ইটের তৈরি। আভ্যন্তরীণ ছাদ শ্লেট দিয়ে তৈরি এবং উইন্ডোতে ব্যবহৃত কাঁচটি বেলজিয়ামের। ফার্নিচারগুলি ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো। ডাকবিভাগ এই চার্চটির দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

জলপাইগুড়ির ১৫০ বছরের পুরনো চার্চ

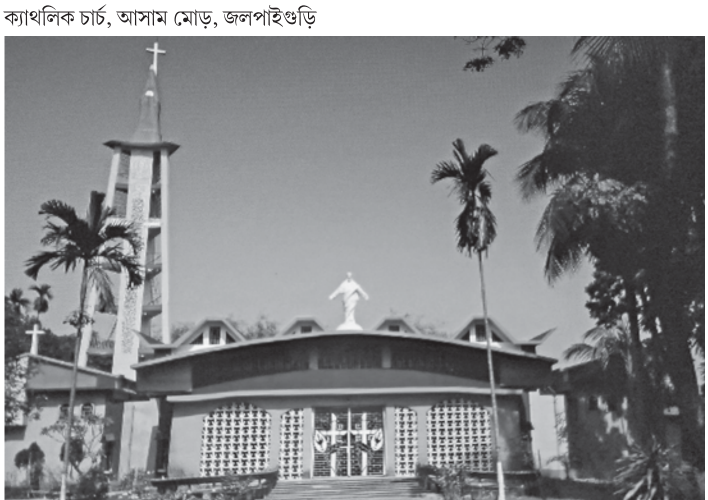

ক্যাথলিক চার্চ, আসাম মোড়, জলপাইগুড়ি

চলে এলাম নয়াবস্তির ব্যাপ্টিস্ট চার্চে। শতাব্দীপ্রাচীন চার্চ। ইউরোপীয়ান প্ল্যানটার্সরা এই চার্চটি স্থাপনে সহযোগিতা করেছিল। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তিতে ব্যাপটিস্ট চার্চও একটি শতাব্দীপ্রাচীন গীর্জা এবং রাজ্য হেরিটেজ কমিশন দ্বারা অনুমোদিত। হেরিটেজ কমিশনের স্বীকৃতি চার্চটির প্রাপ্য ছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সেটি অনুমোদিত হয়েছে। জলপাইগুড়ির এই দুটি শতাব্দী প্রাচীন চার্চ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেলাম রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের প্রাক্তন সদস্য আনন্দগোপাল ঘোষ এবং প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং গবেষক উমেশ শর্মার কাছ থেকে। তবে স্থান সংকুলানের কারণে সেসব তথ্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রেখে রওনা হলাম আসাম মোড়ের দিকে। জলপাইগুড়ির সেন্ট মাইকেল এন্ড অল এঞ্জেলস চার্চ এবং নয়াবস্তিতে অবস্থিত বহু পুরনো ব্যাপ্টিস্ট চার্চ দেখে বেরিয়ে পড়লাম আসাম মোড়ের দিকে। এখানে জলপাইগুড়ির অন্যতম বিখ্যাত একটি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় হোলি চাইল্ড লাগোয়া চার্চটিকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি মানবসেবার কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে বহুদিন। অনাথ, সহায়-সম্বলহীন শিশু, গরিব আদিবাসী সম্প্রদায় সহ সমাজের দুস্থ মানুষের সাহায্যার্থে এই চার্চগুলির ভূমিকাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

বড়দিন পালনে পিছিয়ে নেই ডুয়ার্স

মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটা এবং বানারহাটের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলি চার্চ। ফিনফিনে জরির মত নদীর তীরে, আকাশে হেলান দেওয়া পাহাড়ের ঢালে, সবুজ চা বাগানের আঁচল ছুঁয়ে যেসব অখ্যাত গির্জা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সেইসব জায়গায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালাম। ঘুরে দেখে, কথা বলে বুঝলাম এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে ডুয়ার্সের মানুষের

সালেম গসপেল চার্চ, নাগরাকাটা

প্রাণের উচ্ছ্বাস কেমন যেন এক অনন্য মাত্রা পায়। অন্য ধর্মের মানুষের যোগদানে সেই উৎসব কী আশ্চর্য মন্ত্রে হয়ে ওঠে সর্বজনীন। ঐতিহ্যমন্ডিত দুই একটি চার্চে এর আগে বড়দিনের সন্ধে কাটাবার অভিজ্ঞতা থেকে জানি বড় বড় চার্চগুলির বর্ণময় উৎসবের সঙ্গে প্রান্তিক ডুয়ার্সের বড়দিন উদযাপনের কোনও তুলনা টানা যায় না। তবে বৈভব নয়, উৎসবের মূল কথা যদি হয় একজন মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে অসংখ্য মানুষের যোগ তাহলে বলতে পারা যায় ডুয়ার্স বড়দিন পালনে পিছিয়ে নেই। প্রত্যন্ত ডুয়ার্সের গির্জায় গির্জায় বড়দিন উদযাপিত হয় নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব রীতিতে এবং নিজস্ব ঢঙে। তাই জলপাইগুড়ি, নাগরাকাটা, বানারহাট, ধূপগুড়ি, কালচিনি, হাসিমারা এবং মেন্দাবাড়ির বেশ কিছু চার্চকে ঘিরে এবারের সুহানা সফরের সার্কিট তৈরি করেছি। পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গিতেই বেরিয়ে পড়েছি ডুয়ার্স সফরে চার্চগুলির সুলুক সন্ধান করতে।

সার্কিট নাগরাকাটা

নাগরাকাটা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুক্কাপাড়া মোড়ে চিন্ময়দের বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন সকাল দশটা। চিন্ময় গ্রাসমোর চা বাগানে কাজ করে। বাজারে গিয়েছিল। তাই চিন্ময়ের বউ এবং মায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় লুচি, তরকারি মিষ্টির পরে ধূমায়িত চা সেবন করতে করতেই চিন্ময় এসে হাজির। আজ আমরা মোটরবাইকে যাব ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা, বানারহাট এবং বিন্নাগুড়ি সার্কিটের চার্চগুলিতে। উত্তরে ভুটান রাজ্য, দক্ষিণে বানারহাট এবং ময়নাগুড়ি থানা, পূর্বে বানারহাট আর পশ্চিমে ধূপগুড়ি নাগরাকাটার ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্গত। অতীতে এই জনপদে নাগরা ভুটিয়া নামে এক জনগোষ্ঠী বসবাস করত। এই জনগোষ্ঠীর নাম অনুসারে এই জনপদের নামকরণ করা হয়েছে বলে আঞ্চলিক ইতিহাসে উল্লেখ আছে। বর্তমানে নাগরাকাটা নামে যে স্থান পরিচিত তা নাগরাকাটা চা বাগান মৌজার কিছু অংশ, কিছুটা ভগৎপুর চা বাগান মৌজার অংশ এবং কিছুটা অংশ সুখানিবস্তির অঞ্চল নিয়ে গঠিত। নাগরাকাটা হাইস্কুল, উদ্যান, নাগরাকাটা চা বাগানকে ঘিরে নাগরাকাটা অঞ্চলে আছে বেশ কয়েকটি চার্চ। চিন্ময়ের কাছ থেকে চার্চগুলির একটা তালিকা তৈরি করে নিলাম। প্রথমেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম চিন্ময়দের বাড়ির কাছেই শুক্কাপাড়াতে নিউ ইন্ডিয়া চার্চ অফ গড চার্চে। শুক্কাপাড়া থেকে চার্চটির দূরত্ব সাত কিলোমিটার। এবারে আমরা এগোতে লাগলাম থালঝোরা রোড ধরে সালেম গসপেল চার্চের দিকে। নাগরাকাটার পুরনো বাসস্ট্যান্ড থেকে কূর্তি চা বাগান অভিমুখে চলতে লাগলাম। নাগরাকাটাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের সৌন্দর্যখনিগুলি বেড়াতে যাওয়া যায়। থাকার জন্য নাগরাকাটায় রয়েছে বনবিভাগের বাংলো অথবা চা বাগানের অতিথিশালা। এখন ছোট বড় কিছু হোটেল বা হোম স্টে গড়ে উঠতে শুরু করেছে নাগরাকাটাকে কেন্দ্র করে। আশেপাশে কোন ভিআইপিদের ভিড়ভাট্টা নেই। যখন মন চায় বেড়িয়ে পড়া যায়। থাকা খাওয়ার চিন্তা করে লাভ নেই। একটু বোহেমিয়ান হলেই ভ্রমণে আনন্দ। জলঢাকা ব্রিজ, টিলাপাহাড় হয়ে থালঝোরা যাবার সরু পথ। ইউরোপিয়ান

গ্রেস রিভাইভাল চার্চ, নাগরাকাটা

ক্লাবের মাঠে শীতের নরম রোদের আলোয় ভগতপুর চা বাগানের ওঁরাও, মুন্ডা, যুবক-যুবতীদের ফুটবল খেলা দেখলাম। ডুয়ার্সের চা বাগানে লালমুখো সাহেব আর চোখে পড়ে না। ব্রিটিশরা চলে গেলেও চা বাগানের বৃত্তিগত স্তরবিন্যাস আগের মতই আছে। ম্যানেজারস ক্লাবে বাবুরা এবং বাবুদের আড্ডায় শ্রমিকেরা আসে না। নাগরাকাটাতে রয়েছে কয়েকটি ক্লাব। খেলাধুলা, আড্ডা সবই আছে। যারা বেড়াতে ভালবাসে তাদের ভালো লাগবে। থালঝোরা রোড-এর উত্তর পশ্চিম দিকে মুখ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় অতিক্রম করে চলে এলাম সালেম গসপেল চার্চে। মোটর বাইকে বেশি সময় লাগল না। এবার বেরিয়ে পড়লাম কূর্তি চা বাগানের উদ্দেশ্যে। কূর্তি মন্দির লাগোয়া চম্পাগুড়িতে এন.ই.এল.সি ক্যাথলিক চার্চ। নাগরাকাটা থেকে থালঝোরা রোড হয়ে প্রায় নয় কিলোমিটার এর মত। কূর্তি চা বাগান থেকে ফেরার পথে চলে এলাম ভগতপুর টি এস্টেটের নেপালি লাইনে এভাঞ্জেলিক্যাল পেন্টিকোস্টাল চার্চে। চার্চ দেখে ভগতপুর চা বাগান হসপিটাল, ভগতপুর চা বাগানের চাদর লাইন অতিক্রম করে আমরা রওনা দিলাম সুখানি বস্তিতে অবস্থিত সেন্ট ভিনসেন্ট চার্চে। নাগরাকাটা ছাড়ার আগে গেলাম সুখানিবস্তির নাগরাকাটা চার্চে।

গ্রাসমোর হয়ে বানারহাট সার্কিট

আমাদের এখনকার গন্তব্য গ্রাসমোর। এখান থেকে আমরা যাব ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে গ্রাসমোর চা বাগানের অন্তর্গত গ্রেস রিভাইভাল চার্চে। যদিও প্রাচীনতার নিরিখে চার্চটি খুব পুরোনো নয়, তবুও মানবসেবার নিরিখে চার্চটি ঐতিহ্যশালী। নিকটবর্তী গাঠিয়া, লুকসান, গ্রাসমোর এবং ক্যারণ চা বাগিচার শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এই চার্চের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। গ্রেস রিভাইভাল চার্চের মানবসেবার এই ঐতিহ্যপূর্ণ দিকটিকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। নাগরাকাটা ছাড়াবার পর নামলাম গ্রাসমোড় চা বাগিচার মোড়ে। চা বাগিচার ফ্যাক্টরির সামনে দাঁড়াতে চায়ের সুবাস ভেসে আসে। প্রবেশ করি গ্রাসমোড় চা বাগিচার ফ্যাক্টরিতে। গ্রাসমোরের উল্টোদিক দিয়ে গাঠিয়া এবং লুকসানে যাওয়া যায়। গ্রাসমোড় টি এস্টেট থেকে এলাম গাঠিয়াতে। একদিন এইসব স্থান ছিল শুনশান। মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার জন্য চা-বাগানে একদিকে যেমন শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছিল, অন্যদিকে চা বাগানের অফিসে কাজ করার মত উপযুক্ত শিক্ষিত এবং দক্ষ কর্মচারীর অভাব বহির্জগতের কাছে ধরা দিয়েছিল স্বর্ণখনি রূপে। ঠিকাদারের মাধ্যমে বিহার থেকে উপজাতি শ্রমিক সংগ্রহ করা হত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। কারণ ধরেই নেওয়া হয়েছিল তৎকালীন ডুয়ার্সের নরকতুল্য এবং বৈচিত্র্যহীন আবহাওয়ার সঙ্গে এরা নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারবে না। তাছাড়াও বন থেকে সংগৃহীত সম্পদ তারা দক্ষিণ-পশ্চিমের জনপদে বিক্রি করত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় আর্থসামাজিক অবস্থা। চা বাগিচাগুলিতে মালিকপক্ষের নির্বিচার লুঠপাট এবং সরকারের উদাসীনতা নিয়ে শ্রমিক সম্প্রদায় যখন ব্যথিত এবং হতাশ তখন হতাশায় দীর্ণ শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে এই চার্চগুলির মানবসেবার দিকটিকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। যদিও এইভাবেই ডুয়ার্সে অধিকাংশ চা-শ্রমিক ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

বানারহাটের মোগলকাটায়

আমাদের এখনকার যাত্রাপথ মোগলকাটা চা বাগিচার অন্তর্গত ইগ্নাটিয়াস চার্চ, বানারহাট। ডুয়ার্সের পাঁচালি এবং গল্প শেষ হবার নয়। মোটরবাইকে বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে দফারফা হয়ে গেছে। রাস্তায় পিচ উঠে গিয়ে খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে। বানারহাট থেকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে বানারহাট পোস্ট অফিসকে বাঁদিকে

ব্যাপটিস্ট চার্চ জলপাইগুড়ি

জ্যোতি আশ্রম ক্যাথলিক চার্চ, বড়দিঘি

রেখে বানারহাট হসপিটাল রোড ধরে মরাঘাট টি গার্ডেন। অন্য রুটে বানারহাট থেকে পঞ্চাশ মিটার উত্তর দিকে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে খেলার মাঠের পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে কারবালা রোডে উঠে ডানদিকে প্লেজার পয়েন্ট অতিক্রম করে সাতশো মিটার এগিয়ে ডুয়ার্স স্পাইসি ফুডমার্টকে সামনে রেখে আরও সাড়ে চার কিলোমিটার এগোলে মোগলকাটা চা বাগিচার বাউন্ডারি সীমা। বানারহাট স্টেশন থেকে তোতাপাড়া বাজার হয়ে কারবালা রোড ধরে পৌঁছলাম মোগলকাটা চা বাগিচায়। তোতাপাড়া ছাড়িয়ে মোগলকাটা চা বাগানের বিবর্ণ প্রবেশদ্বার বাঁ দিকে রেখে বাগিচার বাবুদের কোয়ার্টার। পরপর তিনটে কাঠের দোতলা অতিক্রম করে চা বাগানের মাঝখান দিয়ে পৌঁছে গেলাম চা বাগিচার কোয়ার্টারে। বসার ঘর। সঙ্গে আরও কয়েকটি ঘর থাকা খাওয়ার জন্য। চা বাগানের ফ্যাক্টরির পাশে ছোট একটু জায়গা জুড়ে মরসুমি ফুলের গাছ লাগিয়ে কোয়ার্টারের সামনে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত চা বাগান। কোয়ার্টারের সামনে লিচু গাছ। পাশেই ঝাপড়া দুটো রেইন ট্রি। ডাইনে-বাঁয়ে সেগুন এবং শিরীষ গাছ। রাতের বেলা গা ছমছম করে। জোৎস্নারাতে এক অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি হয়। এলাম চা বাগানের হাট হয়ে চার্চে। গ্যান্দ্রাপাড়া রোড এবং কারবালা রোড হয়ে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এই চার্চটি। বানারহাট চা বাগিচাগুলিকে কেন্দ্র করে সেই ধরনের বড় আর কোনও চার্চ নেই। গুডরিকসের বাগানগুলোকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট স্থানীয়ভাবে কিছু চার্চ স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বীরপাড়া মাদারিহাট এবং কালচিনি শহরকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সুপ্রাচীন চার্চ রয়েছে সেই ধরনের চার্চ নাগরাকাটাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও বানারহাট বা চামুর্চি সার্কিটে চোখে পড়লো না। চা বাগানের হাট দেখার মত। একসময় ডুয়ার্সে হাট দেখার নেশায় মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়তাম। মারুয়ার গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। এলোমেলো ঘুরেফিরে এবার রওনা দেওয়ার পালা। তেলিপাড়া মোড় হয়ে সোজা ঢুকবো গয়েরকাটা দিয়ে খুকলুং রাভা বস্তি।

খুকলুং রাভাবস্তি

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লক থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে প্রায় চার কিলোমিটার গিয়ে ঠাকুরপাট। ঠাকুরপাটের পশ্চিমে গোঁসাইরহাট রাজমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ঘেঁসে পাকা রাস্তা ধরে ক্রমশ নিরঞ্জন পাট এবং গাঢ়খুটা নামে দুটি ছোট ছোট শান্ত নিটোল গ্রাম এবং ডুডুয়া নদীর দোলনা ব্রিজ পেরিয়ে গোঁসাইরহাট ফরেস্ট বস্তি অতিক্রম করে উত্তরদিকে প্রায় ঘণ্টাখানেক পায়ে হেঁটে গভীর অরণ্য পেরিয়ে দেখতে পাওয়া যায় ছোট্ট গ্রাম খুকলুং বস্তি। ধূপগুড়ি থেকে ঠাকুরপাট রোড হয়ে খুকলুং ব্যাপ্টিস্ট চার্চ প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। ধূপগুড়ি থেকে ঠাকুরপাট রোড হয়ে নিবেদিতা চাইল্ড একাডেমির পাশে অবস্থিত খুকলুঙ ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরে এক কিলোমিটার গেলেই গোঁসাইরহাট রাভা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। এই বস্তিটির তিনদিকে ঘেরা খুট্টিমারি ফরেস্ট। আর একটা দিকে পাহাড় থেকে প্রবাহিনী নামাই নদী। খুট্টিমারি বনবাংলো, গোঁসাইরহাট ইকো ট্যুরিজম পার্ক থেকে আমরা চলেছি রাভাপল্লী। বনপথের চেহারা বদলে গেল বেশ খানিকটা। খুট্টিমারি পর্যন্ত পথ ছিল কালো পিচ মোড়া। এখন যে পথে আমাদের মোটরবাইক ধুলো উড়িয়ে ছুটছে সেই পথ মোরামের। ইতিমধ্যেই আমরা ঢুকে পড়েছি রাভা গ্রামে। দুপাশের বন এখানে ততটা ঘন নয়। মাঝে মাঝে মানুষের আবাদ করা ক্ষেত-খামার, ঘরদোর, উঠোন সহ ছোট ছোট গ্রাম। অচেনা অজানা গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। সামনে আরও অনেক দৃশ্যের পসরা। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছেদের জন্য জায়গাটা হয়ে উঠেছে অরণ্যের মত। তপ্ত দুপুরে কোকিলের ডাক মুখর করছে বনাঞ্চল। কাঠঠোকরা পাখির ঠুকঠাক শব্দ ভেসে আসছে সারি সারি শাল, সেগুন, মেহগনির বন থেকে। বাঁশের ঝোপে কুবকুব শব্দ। কুবো পাখি ডাকছে। হঠাৎ করে মনে হল পথ যেন এখানে অনেকটাই সরু হয়ে গেছে। দুপাশে ঝাঁকড়া চুলের মত জঙ্গল ঝাপটা মারছে। আসলে পথ সরু নয়। এই পথে অনেকদিন গাড়ির চাকা ছোটে নি। মোটরবাইকে জঙ্গল ধাক্কা খাচ্ছে। রাভা বস্তিতে পর্যটনের কি এমন আনন্দ থাকতে পারে? তাই এই পথে পা বাড়ায় না কোন ডুয়ার্সপ্রেমী। সামনে একটা নদী যার নাম নোনাই। নদীর কাকচক্ষু জলে ঝুঁকে পড়েছে গাছের ডালপালা। প্রতিবিম্ব ভাসছে জলে। নীরব এবং নিস্তব্ধ পরিবেশ। তবু একটা নিস্তরঙ্গ অনুভূতি যেন খেলে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। একটা মৃদু মন্দ হাওয়া কোথা থেকে যেন ছুটে এসে ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। আমরা পৌঁছে গেলাম গোসাইরহাট রাভা পল্লীতে। রাস্তা পেরিয়ে এমন একটা অরণ্যপল্লী যে থাকতে পারে তা এখানে না এলে কল্পনা করা যায় না।

নামের সঙ্গে হাট যুক্ত হলেও আসলে গোঁসাইরহাট জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা। নাথুয়া, খুট্টিমারি এবং গয়েরকাটা দিয়ে জঙ্গল হয়ে ঢোকা যায় গোঁসাইরহাটে। খুট্টিমারি বনবাংলো থেকে আরও তিন কিলোমিটার এগোলে গোঁসাইরহাট ইকো পার্ক। এই পার্কের অনেকটা জায়গা জুড়ে জলাভূমি। শীতকালে আসে পরিযায়ী পাখির দল। তবে সবুজ বনানী আর জলাভূমি থাকায় প্রায় সবসময় শোনা যায় বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কলতান। জলাভূমির কিছুটা অংশে মাত্র কয়েকমাস আগেও ছিল বোটিং এর ব্যবস্থা। কিন্তু প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের অযত্ন এবং অবহেলায় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। খুকলুং যখন পরিচিতি লাভ করে নি তখন ধূপগুড়ি, ঠাকুরপাট হয়ে গ্রামগঞ্জের মধ্য দিয়ে গোঁসাইরহাট পৌঁছানো যেত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টেছে। অরণ্যের কোলে বসবাসকারী রাভারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এখানকার অনেক রাভা একসময় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুদের দেবদেবীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। তারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে কেন খ্রিষ্টান হয়েছেন উত্তরে স্থানীয় এক বর্ষীয়াণ রাভা জানালেন, একসময় রাভাদের মধ্যে হিংসাভাব বেশি ছিল। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। একজন আরেকজনের ক্ষতি করার চেষ্টা করত। পরবর্তীকালে বিরোধ এড়াবার জন্য সকলেই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। এইভাবে দীর্ঘদিন বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়েও তাদের প্রাচীন আদিবাসী সংস্কৃতি রাভারা বজায় রেখে চলেছে। শুধু তাই নয়, এখানকার দু-একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হয়ে নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়া পেলেও অরণ্যের সবুজ পরিবেশকে ত্যাগ করেনি। বরং নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি রীতিনীতি, আচার-আচরণ, খাদ্য, বাসস্থান এর ক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখেছে। ফলে এখনো রাভারা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে পেরেছে। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম খুকলুং রাভা বস্তিতে। আমি কথা বলছিলাম আর চার্চের ছবি তুলছিল চিন্ময়। কিন্তু এই ছবি তোলাতে দেখলাম এক শ্রেণীর স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি। আমরা অবশ্য এই নিয়ে বাদানুবাদে যাইনি। কিন্তু সম্পূর্ণ একটি জনজাতি বস্তি অঞ্চল খ্রীষ্টান হয়ে যাবার পেছনে অন্য গল্প কাজ করছে কিনা সেটা ধরতে পারলাম না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বউ সাথে পথে পথে। পর্ব-৭

দিনাজপুর দেখার শেষ হয় অজিতেশদার মধুপর্ণীতে

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

ভ্রমণ আর ভোজন সঙ্গে অনুঘটক জম্পেশ, নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ আড্ডা হলে তো কথাই নেই। তবে আড্ডা যে বিশুদ্ধ নির্ভেজাল হয় বলে মনে হয় না কারণ পরচর্চা, পরনিন্দা মানে পিএনপিসি হল আড্ডার পাঁচফোড়ন। পিঠ চুলকানি সমিতির অন্যতম সদস্য লবডঙ্কা স্বামী ওরফে পাঁচুগোপাল মিত্তির আমাকে বলতেন, 'ভট্টাচাজবাবুর কাজ হল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ানো।' পাঁচুদা দাদাঠাকুর সম্পাদিত শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া মেইন রোড থেকে প্রকাশিত অর্ধসাপ্তাহিক হিমাচল বার্তায় মিষ্টি মিষ্টি শিরোনামে চমৎকার ধারাবাহিক রম্যরচনা লিখতেন। লিখতে হত ধুপগুড়ি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক লাল নক্ষত্রের বিনোদন বিভাগেও। মূলত নিখিল ও তপনের খোঁচানিতে। সেই সময় থেকে পরিচয় রঘু ওরফে পুণ্যশ্লোকের সঙ্গে। অন্যমন দাশগুপ্ত, জীবন সরকারের সাথেও যতদূর মনে পড়ে রঘু 'শব্দ' নাম দিয়ে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করত। জাত কবি কিন্তু বোহেমিয়ান। সে এক দিন গেছে বটে। আমার রাতের আস্তানা ছিল হাট কোয়ার্টারস। প্রযত্নে নিখিল বসু। নিখিলের সাহিত্য পত্র ছিল 'পাহাড়তলী' সঙ্গে গীতাংশু, বিপুল, জলিল আরও অনেকে। আমরা তখন অকৃতদার। বন্ধনহীন উল্কার মত ঘুরে বেড়াই।

সাত পাকে বাঁধার পর হলাম ল্যাজে গোবরে। গিন্নির কথা— 'তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি। বৈরাগীর থলি নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ভাল করতে।' আবার অনেকে উপদেশ দিত— বাপু হে দু'-চারটে টিউশনি করলে তো পার। এভাবে ধর্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে না বেড়িয়ে। হেড স্যার বলতেন— 'গৌরী অ্যাতো বাউন্ডুলেপানা ভাল নয়। ছুটির হিসেবটা খেয়াল রেখো। অবসরের সময় কিন্তু ঝামেলায় পড়তে হতে পারে।' 'বটে! হিসাব মিলাতে মন মোর নাহি রাজি।' ভ্রমণের ভূত মাথায় চেপে বসে আছে। সমস্যটা বাড়ল গিন্নি যখন কাঁধে চাপল। কিছু করবার নেই। এখন দু'জনেই ঝগড়াঝাটি, রাগারাগি, মন কষাকষি, কুলির পেছনে ছুটোছুটি যেমনই হোক বিন্দাস সফর। হেসেখেলে ঘুরে বেড়াই যত দিন আছি এই ধরাধামে।

বেড়াতে বেরিয়ে শুধু প্রকৃতি বন্যপ্রাণ, মন্দির, রাজবাড়ি যাই দেখি না কেন আমি খুঁজে বেড়াই বলতে পারেন ভালবাসি মানুষ রতনকে। কত অচেনা মানুষ, পরিবার, পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে যেন গত জন্মের পরিচয়। সম্প্রতি পুরীতে দীর্ঘসময় কাটানোর সময় হোটেলে পরিচয় হয় ভুপালের তিলক চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গে। জানি না আমাদেরকে কেন তারা এত আপন করে নিয়েছিলেন। আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, বেড়ানো, কেনাকাটি করি। সমুদ্র তীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো। আসার দিন ছলছল চোখে আরতি, পুত্র দেব, তিলকবাবু চোখ মুছতে মুছতে বারংবার অনুরোধ করেন 'আপনাদেরকে ভুপালে আমাদের বাড়িতে আসতেই হবে। তবেই আমরা শিলিগুড়ি যাব।' এমনই ভাবে পরিচয় ঘটে আন্দামানের জলিবয়ের কাছে কবি ঝর্ণা হালদারের সঙ্গে। আড্ডায় মেতে উঠি জংলিঘাটে অনাদিদের বাকপ্রতিমার ছোট্ট ঘরে। এসব স্মৃতি জলছবির মত আমাদের চোখে জ্বলজ্বল করে।

এমনই একজন কালিয়াগঞ্জের ধনা ওরফে ধনঞ্জয় রায়। গবেষক, লেখক, শিক্ষক, লোকসংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর চিন্তাভাবনা করতেন। আমাদের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের পরিবারের মধুর সম্পর্ক। যে স্মৃতি বারবার তাড়িয়ে বেড়ায় এবং অনেকবার উল্লেখ করেছি তা হল রায়গঞ্জের বীরনগরের 'করুণাধারায় এসো'-র সুনীল চন্দকে নিয়ে বেড়ানো তারপর ধনার বাড়িতে যাওয়া। কবেকার স্মৃতি। পরম অতিথি বৎসল ধনঞ্জয় ও সুনীল দু'জনেই। মনে আছে ধনাদের বাড়ি থেকে চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে মধ্যরাতে নিঝুম পথে করুণাধারায় ফেরা। জেগে ছিল শুধু সারমেয়র দল। দেখা হলে সুনীলের সঙ্গে স্মৃতি রোমন্থন। পুরনো সেই দিনের কথা সেকি ভোলা যায়! সস্ত্রীক স্কুল পাড়ায় ধনঞ্জয়দের বাড়িতে যাওয়া থাকা আবার কখনও নজমু নাট্য নিকেতনে বহরাকালী মন্দিরের মুখোমুখি। গাড়ি নিয়ে ঘুরপাক দেহাবন্দ। ছিরিমতী নদী মহিষবাথান মুখোশের দেশ। ইহাহার, আমাতি, কুনুর।

মাস কয়েক আগে সুনীল এসেছিল শিলিগুড়ি। কথায় কথায় আবার স্মৃতিরোমন্থন। গৌরীদা ধনাদের বাড়ির গল্প, ওর ভোজনবিলাস আন্তরিকতা, আপ্যায়ন, কুলিকের পাখিদের কলরব, বিন্দোল বেড়ানো, কবি অশোক রায়ের বাড়িতে জম্পেশ আড্ডার কথা, বিশেষ করে গুড়া মাছের চচ্চরি, সুগন্ধি তুলাইপাঞ্জি, একটু গব্য ঘৃত। এমনি কাঁচা মরিচ, আর দুপুরে ট্যাঙস ট্যাঙস করে বুরহান ফকিরের ধ্বংসাবশেষ, অলৌকিক পুকুর। ফিরতে ফিরতে রাত। রায়গঞ্জের আড্ডার কথা এখন চক্ষুপটে ভাসে। দুর্ভাগ্য পুরনো বন্ধুদের একে একে চলে যাওয়া মনকে ব্যথিত বিষণ্ণ করে তোলে।

আবার সস্ত্রীক রায়গঞ্জ থেকে কালিয়াগঞ্জ। রাত্রিযাপন ধনাদের বাড়ি। আদর আপ্যায়ন ষোল

দুর্গাপুর রাজবাড়ি, রায়গঞ্জ

আনা তবে একবার রাতের বেলায় কীভাবে একটা নেংটি ইঁদুর মশারির ভিতরে ছুটোছুটি পায়ে সুড়সুড়ি। মধ্যরাতে ধনার স্ত্রীকে ডেকে তুলি। তারপর অন্য একটা ঘরে স্থানান্তর। আসলে বিস্তর গ্রন্থরাজির মাঝখানে তক্তাপোষ। সকাল বেলায় চা-নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ি। এক জায়গায় কতবার থাকা তবু ভাল লাগে মুখোশের গ্রাম, গ্রামীণ সৌন্দর্য, বিশেষ করে কুনুর গ্রামটি। শস্য শ্যামলিমাময় ছবির মত গ্রাম। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া। আসলে পর্যটন দপ্তর কিছুই করছে না উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের পর্যটন নিয়ে। দুর্গাপুর, বাহিন জমিদার বাড়ি শুধু নয়, পুরাতত্ত্বের আকর দুই দিনাজপুর। ধনঞ্জয় সুর করে শোনাত চাল চিড়া চট গুড়— এই চারে দিনাজপুর। সে যাই হোক ধনার অনুরোধ মিয়া-বিবি দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন কালিয়াগঞ্জে কাটাই। সেবারে রাত্রি যাপন নজমু নাট্য নিকেতনে। বয়রা কালী মন্দিরের মুখোমুখি। দোতালায় আমাদের ঘর থেকে মন্দিরের আরতি, ঘণ্টা ধ্বনি, ভক্তদের কোলাহল, মায়ের মুখ সুন্দর দর্শন করতাম। আমরা ধনঞ্জয়ের বাড়ির পেছনে আবার বাইরে শস্তার হোটেলেও খাওয়াদাওয়া হত। নবমীর দিন দু'জনে পরিচিত গুদরী বাজারে সারাদিন কাটাই। ধনার সঙ্গে কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, আসাতি, ধনকল কত জায়গায় না গেছি। আসলে ধনার ছিল পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস জানার প্রবল ইচ্ছা। গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে গবেষণার কাজে ঘুরে বেড়াত। প্রায়শ বলত, 'গৌরীদা আমার খুব ইচ্ছা পাকিস্তানে যাবার। মহেঞ্জদারো হরপ্পা দর্শন। তুমি রেডি আছ।' ধনার জন্য পাশপোর্ট করা। অকালে চলে গেল ধনা। পাকিস্তান যাওয়া আর হবে না। আর এখন যা উত্তপ্ত পরিবেশ। দু'দেশের দরজা বন্ধ।

রায়গঞ্জ থেকে মালদা কয়েক ঘণ্টার পথ। আমার প্রিয় শহর হলেও পথঘাট যেন ঘুলঘুলাইয়া। ইংলিশবাজার, রথতলা, কানির মোড় থেকে ৪২০ মোড়। কলেজে পড়ার সময় দার্জিলিং মেলে অনেক রাতে স্টেশনে নেমে পুরাটুলির ঘুপচি গলির ভিতরে বন্ধুর মেসে উঠি। দু'দিন থাকা। গৌড়, পাণ্ডুয়া, আদিনা দর্শন। পুরনো মালদার প্রতি আমার বড্ড আকর্ষণ। যেমন ঘর তেমনই ছাদ প্রাচীনত্ব পুরাতনী গন্ধে ভরা। মালদার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। পুঁথিপুস্তকে সেসব লেখা আছে। আমি আর সাত নকলে খাস্তা বানাতে চাই না। তবে যেটুকু পড়াশোনা তার মধ্যে শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বিরচিত ছোট্ট অথচ অসম্ভব মনোগ্রাহী গৌড় পাণ্ডুয়া অসাধারণ। তাঁর মন্তব্য— '...যদি স্মৃতির শ্মশান দেখিতে চাও— যদি উদ্ভাবনী শক্তির ও পূর্তকার্য্যের প্রতিভা দেখিতে চাও, তবে মালদার প্রাচীন গৌড় নগরে আইস।'

নানা সময়ে, নানা ঋতুতে মালদা বেড়ান। কখনও সাহিত্য সংস্কৃতি কবিতা পাঠ, কখনও স্রেফ বেড়ান, ঘোরাঘুরি। আমার সব থেকে ভাল লাগে আমবাগানে বেড়ান এবং সেটি যদি ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে হয় তো দারুণ শিহরণ জাগায়। আমার এখনও ভাল লাগে গৌড়ের আকর্ষণ, তেমনই আদিনা। কিন্তু সবার থেকে ভাল কানসাট, রসকদম্ব, আমসত্ব, আমচুর, আচার। একবার চাঁচল রাজবাড়ি দর্শন করে বেড়াতে চাই কলিগ্রাম বকচরা গ্রাম, নতুন চালের পায়েস, ক্ষীর। সস্ত্রীক বহুবার মালদহে বেড়াতে গেছি। কখনও আত্মীয়স্বজনের কাছে, কখনও হোটেল লজে। তবে সেরা স্মৃতি প্রদ্যোৎদার সঙ্গে মালদহ সদর। দু'জনেই পেটুক, গদ্যপদ্য গুরুগম্ভীর আলোচনার ফাঁকে প্রদ্যোৎদা কানে কানে বললেন, 'চলো একটু বাইরে'। মানে কিছু খাওয়া। ভাজাপোড়া ওনার ভীষণ প্রিয়। আমরা ছিলাম বঙ্গলক্ষ্মী হোটেলের দোতালার একটি ঘরে। দিনভর কবি, লেখকদের সঙ্গে আড্ডা, ভ্যাদরা প্যাঁচাল অবিরাম। মনে পড়ছে আতাউর ভাই, আবদুস সামাদ, বালুচরের সুধীরদা, পুষ্পজিৎ রায়, গোপাল লাহা, কমল বসাক কত জনের নাম বলব। অনেকে চলে গেছেন চিরতরে। আর সেই গৌড় নগরী আর নেই। ভয়াবহ যানজট, দৃশ্যদূষণে জেরবার। মাস কয়েক আগে কানির মোড় ছাড়িয়ে ইদগাহের মাঠের কাছে একটি হোটেলে ছিলাম। ঠিক করে দিয়েছিলেন পুনশ্চর সুশান্তবাবু। সেখানে জবর আড্ডা হত। নিয়মিত আসত সংবেদনের আশুতোষ, গোপাল লাহা, আরও অনেকে। আশু বলেছিল, 'গৌরীদা আপনাদের জন্য আগামীকাল আমসত্ব, কানসাট, রসকদম্ব নিয়ে আসব হোটেলে। নিয়ে যাব আমার

ধনার সঙ্গে কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, আসাতি, ধনকল কত জায়গায় না গেছি। আসলে ধনার ছিল পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস জানার প্রবল ইচ্ছা। গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে গবেষণার কাজে ঘুরে বেড়াত। প্রায়শ বলত, 'গৌরীদা আমার খুব ইচ্ছা পাকিস্তানে যাবার। মহেঞ্জদারো হরপ্পা দর্শন। তুমি রেডি আছ।' ধনার জন্য পাশপোর্ট করা। অকালে চলে গেল ধনা। পাকিস্তান যাওয়া আর হবে না। আর এখন যা উত্তপ্ত পরিবেশ। দু'দেশের দরজা বন্ধ।

বইদোকান অতুল মার্কেটে। দুর্ভাগ্য দুম করে আশু চিরবিদায় নিল। আশুর পরম বন্ধু স্বপন মন্ডল খুবই কষ্ট পেয়েছে। দু'জনেই ছিল হরিহর আত্মা। আশুর মৃত্যু আমার কাছে ভীষণ কষ্টদায়ক। তারপর যা হয় ধীরে ধীরে আমরা স্মৃতি থেকে যেন ভুলে যাই। স্তম্ভিত, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি মৃত্যু সংবাদে। স্বপন থাকে অনেক দূরে পুরুলিয়াতে। শুধু যাওয়াআসা। শুধু স্রোতে ভাসা...।

মালদা থেকে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে যাই রামকেলি। ভয়ঙ্কর জানজটে হাঁসফাঁস, সাংঘাতিক অবস্থা। তবে রামকেলি যেন আগের মতনই আছে। টালি, খাপরার চাল, এখানে ওখানে ঘুঁটের স্তুপ, জরাজীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে মজাপুকুর, গাছপালা নুইয়ে পড়েছে। হাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক করছে। দামাল ছেলের দল সাঁতার কাটছে। গাঁয়ের বধূরা পুকুর পাড়ে খোশগল্পে মগ্ন। প্রবেশ পথে কেলি কদম্ব তলে মহাপ্রভু দু'হাত মেলে প্রেম বিতরণ করছেন। মন্দিরে যাই। শান্ত সুন্দর পরিবেশ। থাকার ব্যবস্থাও আছে। কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা দেখতে গেলাম গৌড়। শুধু একটুখানি দেখা। ঝাঁকি দর্শন। লুকোচুরি দরজার কাছে চা-মুড়ি খেলাম। তারপর ফেরা।

স্মরণীয় স্মৃতি মালদা থেকে রেলপথে বালুরঘাট বেড়াতে যাওয়া। সবে রেলগাড়ি চলতে শুরু করেছে বালুরঘাট পর্যন্ত। বেড়ানোর ভ্রমণসূচি তৈরি করেন অজিতেশদা। পরিকল্পনা ওনাকে সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক বেড়াব হেথাহোথা। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন পৌরসভার অতিথি নিবাসের দোতালায়। মামুলি ঘর তেমনই বিছানাপত্র কম্বল। যাইহোক পৌঁছে স্নানপর্ব সেরে হোটেলে নিরামিষ আহার খেয়ে একটু গড়াগড়ি দিয়ে বিকেলে মিয়া-বিবি হাজির হলাম শিবতলীতে। বৌদি বললেন— 'উনি উপরে বিছানায়। শরীরটা ভাল নাই ক'দিন থেকে।' সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখি পুঁথিপুস্তকের মাঝখানে লম্বা মানে শয়নে আছেন। '—এসো গৌরী।' বউকে সাথে করে আসাতে খুব খুশি। শিলিগুড়ির বাড়িতে অজিতেশদার সঙ্গে গিন্নির আগেই পরিচয় ছিল। তাছাড়া ওনার ভায়রার সাথেও। '—বুঝলা গৌরীশঙ্কর শরীরটা বেগরবাই করছে। কটিদেশে ব্যথা।' বললাম, 'আর কত? নাটবল্টু তো ঢিলা হবেই। বয়সের ধর্ম।' 'ঠিক বলেছ।' অজিতেশদাকে দেখেছি শিলিগুড়ি-বালুরঘাট বাসে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে। প্রায় এক রাতের সফর। মধুপর্ণীর জন্য অমানুষিক খাটুনি, ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করতেন। বলতেন, 'মধুপর্ণী আমার সন্তান।' আজ ভাবি কত জেদ, ধৈর্য, নিষ্ঠা, প্রতিকূল অবস্থায় জেলাভিত্তিক মধুপর্ণী প্রকাশ করে গেছেন যা কিনা ওনার মতন মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

যাইহোক যখন জিজ্ঞাসা করলাম— 'আগামীকাল যাবেন তো আমাদের সঙ্গে?' '—গৌরী আমাকে বাদ দাও। বরং তোমাকে লোক ঠিক করে দিচ্ছি।' রতন না হলে নির্মলেন্দু তালুকদার। একটু দমে গেলাম অজিতেশদা না যাওয়াতে। টেলিফোনে রতন দাসকে ডাকিয়ে আনা হল। লেখালেখি করেন। গদ্য-পদ্য। হাসিখুশি প্রকৃতির। পরিচয় হবার পর বললেন— 'ঠিক আছে আগামীকাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব। শুর হবে বোল্লা থেকে শেষ হবে বানগড়, জেল্লা, দিঘি, এইসব। গাড়ি স্ট্যান্ডে গিয়ে ঠিক করে নেব। আপনারা ব্রেকফাস্ট খেয়ে রেডি থাকবেন। আমি ঠিক সময়ে গাড়ি নিয়ে চলে আসব বুঝলেন। হিলি স্টেশন ভারি মজার। হাত বাড়ালেই বাংলাদেশ। চামুন্ডা মন্দির, একজন পরিচিত পরিবারে গিয়ে চা-টা খেয়ে তারপর টইটই করতে করতে বানগড়। বলতে ভুলে গেছি অজিতেশদা আগেই বলেছিলেন— 'গৌরী দুপুরে গঙ্গারামপুরে লবণের হোটেলে খেও। রতনের সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে। আমি যে সময়ের কথা বলছি বালুরঘাটে তেমন ভাল হোটেল-লজ ছিল না। অতিথি অভ্যাগতরা থাকতেন পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়িতে। যাই হোক বানগড় দর্শন করে, ডান হাতের পর্ব লবণের হোটেলে তারপর অধ্যাপিকা শিবানী রায়ের তত্ত্বাবধানে আলয় আশ্রম যাওয়া। দিঘি দর্শন এবং কানন উদ্যান কত কী! সব কি আর মনে আছে? তবে শিবানীর কর্মনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হই। সন্ধ্যালোকে তপন হয়ে বালুরঘাট। গাড়ির খরচ মিটিয়ে রতনবাবুকে বললাম— একটু চা খান তারপর বাড়ি যাবেন। অনেক পরে জানতে পারি রতন দাস চিরকালের মত চলে গেছেন। অজিতেশদাও নেই। হাস্যোজ্জ্বল রতন দাসের মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে। সুলেখক, সম্পাদক, সাংগঠনিক সাহিত্যঅন্ত প্রাণ অজিতেশদার বিদায়ও বড় বেদনার। ভরা থাক স্মৃতি সুধায়।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক কাহিনি। পর্ব ৬

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

অল্লরাজের সঙ্গে বৈঠকের পর দুর্যোধন বুঝতে পারলেন যে তাঁদের পরিকল্পনার পথে যদি কেউ বাধা হয়ে উঠতে পারে তবে সে হল বড়দা যুধিষ্ঠির। অবশ্য যুধিষ্ঠির যে ঘটনাচক্রে পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারছেন তা জানা নেই দুর্যোধনের। ভূতমিত্রের আশ্রমে বার্ষিক যজ্ঞের আয়োজন ক্রমেই জমে উঠছে। মুণিকে নিয়ে যজ্ঞের উপকরণ কিনতে গিয়ে ভুসুকু দেখেছিল আশ্রমিক অদত্তকে। তাঁকে কিছু বলছিল পুন্ডরীকাক্ষ। কেন? জড়বাদী বৃহস্পতির কাছ থেকে অভূতপূর্ব তথ্য লাভ করার পর যুধিষ্ঠিরও বা কী করবেন?

২০

হস্তিনাপুরের অধীনে যত রাজ্য আছে সেগুলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ। রাজারা হস্তিনাপুরের আনুগত্য স্বীকার করে কর দেয়, কিন্তু রাজ্য চালাতে পারে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও চালু। খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা না হলে হস্তিনাপুর এইসব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে নাক গলায় না। মূল হস্তিনাপুর রাজ্যের প্রজাদের সমস্যা না হলে মিত্ররাজ্যগুলির ব্যাপারে হস্তিনাপুর উদাসীনই থাকে। তবে রাজ্যগুলির মধ্যে সমস্যার আদৌ অভাব নেই। জটিল-তাত্ত্বিক সমস্যা হলে বিবদমান রাজাদের প্রতিনিধি হস্তিনাপুরে আসে আলোচনার জন্য। এরপরেও সমস্যা চলতে থাকলে যুদ্ধ অবধারিত।

বেশ কয়েক বছর ধরে কর্কটপুর এবং পক্ষিস্থান নামক দুটি রাজ্যের মধ্যে সীমানা নিয়ে গোলমাল চলছে। কয়েকবার ছোটখাট যুদ্ধও হয়েছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোনও রাস্তা এখনও মেলে নি। এ নিয়ে হস্তিনাপুরে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা ছিল। দুই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি তাই হস্তিনায় এসেছেন আলোচনার জন্য। ঠিক হয়েছে আজ বেলা দ্বিপ্রহর আড়াই দণ্ড কালে ব্যাসদেবের বাসভবনে আলোচনা বসবে। উপস্থিত থাকবেন ভীষ্ম। সেই উপলক্ষ্যে ভীষ্ম দ্বিপ্রহর নাগাদ ব্যাসদেবের বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। দু'জন কিছুক্ষণ রহস্যালাপ করে আলোচনায় এসে বসেছেন। দুই বিবদমান রাজ্যের প্রধান সেনাপতিরা তাঁদের নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করল।

'সমস্যাটা ঠিক কী?' ব্যাসদেব আলোচনা শুরু করলেন।'আমি যতদূর জানি দুই রাজ্যের সীমানা ঠিক করে দিয়ে বহুকাল আগেই হস্তিনাপুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা নিয়ন্ত্রণ রেখা খুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা কি আপনারা মানছেন না?'

'না মানার কোনও কারণ নেই মহর্ষি!' কর্কটপুরের সেনাপতি সবিনয়ে বললেন। 'কিন্তু সমস্যা হল সে ঘাস গজিয়ে সে রেখা কোথাও কোথাও বুঁজে গেছে।'

'ঘাস তুলে খুঁড়ে দিলেই তো হয়।'

'সে দায়িত্ব পক্ষিস্থানের প্রশাসন নিজেরাই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই রেখার গতিপথ বদলে অতিরিক্ত ভূখণ্ড নিজেদের করে নিয়েছেন।'

'বাজে কথা!' আর বিনয়ের সঙ্গে জানালেন পক্ষিস্থানের প্রধান সেনাপতি। 'বড়জোড় কোনও বাধা অতিক্রমের জন্য রেখা দু-তিন হাত বাঁকিয়ে দিতে হয়েছে। এটা স্বাভাবিক।'

'দশ হাত হলেও স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আপনারা রেখার এক একটি বাঁকে একটা করে গ্রাম নিজেদের করে ফেলেছেন।'

'অসত্য অভিযোগ! লম্বপত্র, ঝটিকাপুর, ভগ্নসরোবর, তাম্রকিরণ, শাখাপুর, হরিদ্রাময়— এইসব গ্রাম চিরকাল পক্ষিস্থানের সীমানায় ছিল।'

'প্রমাণ কই?'

'আপনাদের ছিল— তার প্রমাণ কই?

ভীষ্ম দু'জনকে থামিয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'আপনার সমস্যা মেটাতে চান না যুদ্ধ চান?'

উত্তরে দুই সেনাপতিই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ কাম্য নয়, কিন্তু শেষাবধি যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও উপায় তাঁরা দেখতে পারছেন না। তাঁদের উত্তর শুনে ব্যাসদেব পরম বিস্ময়ে ভীষ্মকে বললেন, 'এরা এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যুদ্ধ করতে চাইছে কেন?'

'আর বলবেন না!' ভীষ্মর রাগত স্বর শোনা গেল। 'সেদিন গোকর্ণ রাজ্য থেকে মন্ত্রীদের প্রতিনিধি দল এসেছিলেন। তাঁদের সমস্যা হল গোকর্ণরাজ সারা বছর কেবল দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। রাজকার্যে কোনও মন নেই। বলীবর্দপুরের রাজা আবার ঘোষণা করেছেন যে প্রজাদের প্রমাণ করতে হবে তাঁর সেই রাজ্যেরই প্রজা। —এরা যে কেন মরতে রাজমুকুট পরে!!'

'রাগ করার মতই ব্যাপার সব।' ব্যাসদেব সান্ত্বনার সুরে বললেন। তারপর সেনাপতির দু'জনের উদ্দেশে বললেন, 'আলোচনা সমাপ্ত। আপনারা যুদ্ধ করতে পারেন।'

'আমরা তো চাই না এসব।' কর্কটপুরের সেনাপতি যেন খুব দুঃখ পেলেন। 'কিন্তু সীমান্তের ওপাড় থেকে বিনা প্ররোচনায় যদি ঘনঘন তির এসে আমাদের ভূমিতে পড়ে তবে যুদ্ধ ছাড়া উপায় কী?'

'তির মোটেই ইচ্ছে করে ছোঁড়া হয় না মহর্ষি!' পক্ষিস্থানের গলা শোনা গেল। 'সীমান্ত বাহিনীতে নতুন যোগ দেওয়া যুবকেরা তির ছোঁড়া অভ্যাস করে। কাঁচা হাত বলে দু-চারটে ওপাড়ে চলে যায়। তা ছাড়া ওনারাও কি ভুল করে অতিকায় গুলতি নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডগুলিকে আমাদের দিকে পাঠান না? গত একাদশীতেই তেমন পাথরে আমাদের তিনজনের মাথা ফেটেছে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।'

কর্কটপুর প্রতি আক্রমণে করতে যাচ্ছিল।

তার আগেই ভীষ্ম প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, ‘বেরিয়ে যান! আলোচনা সমাপ্ত!’

দু’জন খুশি মনেই বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল আলোচনা সফল হয়েছে।

সেনাপতিরা বেরিয়ে যেতেই ব্যাসদেব ইশারা করলেন। একজন দাস এসে একটি সুবর্ণখচিত কলস রেখে গেল। ভীষ্ম সেদিকে তাকিয়ে একটু শান্ত হলেন। বললেন, ‘সোমরস নাকি?’

‘নিজে বানিয়েছি।’

ভীষ্ম কিছু না বলে দু’হাতে কলসীটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা রস পান করে হৃষ্টচিত্তে মুখ মুছলেন। ‘চমৎকার স্বাদ। মন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আশা করি রসপানে সতেজতা ফিরে পাবে।’

‘মনক্লান্তির কারণ কী গঙ্গাপুত্র?’

‘দুর্ভাবনা।’

‘রাজ্যে তো শান্তি বিরাজমান গঙ্গাপুত্র। আপনার দুর্ভাবনার উপযুক্ত কিছু ঘটছে বলে জানি না। তবে?’

‘আপনি কি দুর্যোধনের নতুন বন্ধুটির বিষয়ে অবগত?’

‘সেই লালচুলের লোকটির কথা আমি শুনেছি। দুর্যোধনের বন্ধু হওয়া মুখের কথা নয়। কর্ণ অতি উচ্চাঙ্গের তিরন্দাজ। সে পেরেছে। লালচুলো লোকটি কি উঁচু দরের যোদ্ধা?’

‘সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। কিন্তু সেই ব্যক্তি কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়।’

ব্যাসদেব কথাটা শুনে ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। বললেন, ‘সিংহাসন নিয়ে ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ খুব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অদ্যাবধি কুরুবংশে এমন ঘটনা ঘটে নি।’

‘যদি যুদ্ধ অবধি পৌঁছোয় তবে আমি দুর্যোধনের পক্ষে যেতে বাধ্য।’

ব্যাসদেব কিছু বললেন না। ভীষ্মের জন্য তাঁর খারাপ লাগল। সত্যি সত্যি যদি দু-পক্ষের কোনওদিন যুদ্ধ হয় তবে ভীষ্ম কোনও অবস্থাতেই পাণ্ডবদের পক্ষ নিতে পারবেন না। আজকের এই হস্তিনাপুরের উজ্জ্বল দিনগুলির দিকে তাকালে মনেই হবে না এখানে কোনও সঙ্কট রয়েছে। কিন্তু চিরকাল সব এক রকম থাকে না। শান্তিও না।

‘সৈন্ধবী ভাষা সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে মহর্ষি ব্যাসদেব?’ ভীষ্ম জিগ্যেস করলেন।

‘এ কথা কেন জিগ্যেস করছেন?’

‘সৈন্ধবদের প্রতিশোধের বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। তাঁরা কি এখনও অস্তিত্ববান।’

‘বলা কঠিন।’ ব্যাসদেবকে চিন্তিত মনে হল। ‘সিন্ধু নগর ধ্বংস হলেও সে নগর থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁরা এতকাল পরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে বলেও মনে হয় না। আমি আপনাকে একটি জিনিস দেখাতে পারি।’

‘কী?’

‘অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন গঙ্গাপুত্র।’

ভীষ্মকে নিয়ে ব্যাসদেব ভেতরে গেলেন। বেশ কয়েকটি কক্ষ পেরিয়ে তাঁর উপস্থিত হলেন একটি বৃহদায়তন বিশিষ্ট কক্ষে। সে কক্ষে কেবল পুথির স্তূপ। সারা জীবনে ব্যাসদেব যত পুথি সংগ্রহ করেছেন, সব সেখানে রাখা আছে। ব্যাসদেব সেই পুথিগুলি থেকে সন্তর্পণে একটি পুথি টেনে বের করলেন। কাপড়ে মোড়ক খুলে পুথিটি বের করে এগিয়ে দিলেন ভীষ্মের দিকে। তিনি সেটা হাতে নিয়ে কাঠের মলাটটি ওল্টালেন। পুথিটি সংক্ষিপ্ত। মাত্র দশ বারোটি পাতা রয়েছে তাতে। কিন্তু লিপিটি অচেনা। এমন লিপিভীষ্ম কখনও দেখেন নি। এই লিপির পাঠোদ্ধার তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

‘এই পুথি আমি সংগ্রহ করেছিলাম দক্ষিণের সমুদ্রপাড়ের এক দেশ থেকে। এই পুথি সৈন্ধবী ভাষায় লিখিত।’

‘এ ভাষা আপনার জানা?’

‘না গঙ্গাপুত্র।’ ব্যাসদেব ম্লান হাসলেন। ‘সমুদ্রপাড়ের এক অসামান্য জ্ঞানী ব্যক্তি আমায় বলেছিলেন যে এই ভাষার নাম সৈন্ধবী। তিনি বলেছিলেন, এই পুথিতে একটি গল্প লেখা আছে। গল্পটি তিনি আমাকে অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন। তাই পড়তে না পারলেও এই পুথিতে যা লেখা আছে সে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত।’

‘এই পুথি আমাকে কয়েক দিনের জন্য দিতে পারেন মহর্ষি?’

‘অবশ্যই।’ ব্যাসদেব যেন খুশি হলেন। ‘আপনার মত বীর অথচ জ্ঞানমার্গের পথিককে পুথিটি আমি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে দিতে পারি।’

‘আমি একটি পরীক্ষা করতে চাই।’ ভীষ্ম পুথিটি পুনরায় কাপড়ে মুড়ে ফেললেন। ‘কেউ যদি দাবী করে যে সে সৈন্ধবী ভাষা জানে, তবে এ পুথি সে পড়তে পারবে।’

‘সে পড়তে পারল কি না তা বোঝার জন্য আপনাকে গল্পটি জানতে হবে গঙ্গাপুত্র।’

‘গল্পটি বলুন।’

‘বড় চেনা গল্প গঙ্গাপুত্র!’ ব্যাসদেব সামান্য হেসে বললেন। ‘রামায়ণের গল্প। কিন্তু আমরা রামায়ণে গল্প যেভাবে জানি এটা তার থেকে আলাদা।’

ভীষ্ম অবাক হলেন। বললেন, ‘আলাদা?’

‘হ্যাঁ। এই রামায়ণে দশরথ সিন্ধুদেশের রাজা। তাঁর দুই ছেলে। রাম আর লক্ষ্মণ। সুমদ্রপাড়ের দেশ লঙ্কার রাজকন্যা হলেন সীতা। তাঁকে যে রাবণ অপহরণ করেছিলেন, তাঁর রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর।’

‘কী সাঙ্ঘাতিক!’ ভীষ্ম চমকে উঠলেন। ‘এ তো স্পষ্টভাবে হস্তিনাপুরের প্রতি বিদ্বেষের উদাহরণ মহর্ষি!’

‘একদম তাই।’

ব্যাসদেব এগিয়ে এসে ভীষ্মের কাঁধে হাত রাখলেন। ভীষ্ম লক্ষ্য করলেন মহর্ষির চোখ ছলছল করছে। তিনি বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন, ‘এ কী দেখছি! ভুয়োদর্শী ব্যাসদেবের চোখ জলে ভরে আসছে!’

‘হস্তিনাপুরের প্রতি সৈন্ধবদের বিদ্বেষ একটি বাস্তব ঘটনা গঙ্গাপুত্র! আজ এত বছর পর হয়ত যাদের শরীরে সৈন্ধব রক্ত বইছে, তাঁরা সবাই এই বিদ্বেষ মনে রাখে নি। কিন্তু কেউ কেউ মনে রাখতেই পারে। অস্ত্রবলে হস্তিনাপুর অপরাজেয়, কিন্তু বিদ্বেষের বাষ্প যদি একবার হস্তিনাপুরের অন্তরে প্রবেশ করে তবে এ সভ্যতা ধ্বংস হতে সময় লাগবে না গঙ্গাপুত্র! কিছু একটা কর!’

ভীষ্মের গলা ধরে এল। হস্তিনাপুর তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। কত যুগ ধরে কত মহাবীর, কত মহৎ রাজা হস্তিনাপুরকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। অসুরদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করেছেন। তিনি নিজেও হস্তিনাপুর রাজবংশকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সেই হস্তিনাপুর কি ধ্বংস হয়ে যাবে? না না! এ অসম্ভব! নিশ্চই দেবদূতাবাস থেকে কোনও বার্তা আসবে। একটা কোনও উপায় নিশ্চই পাওয়া যাবে!

ভীষ্মের মুখ মন্ডল কঠিন হয়ে উঠল। তিনি কোষবদ্ধ তরবারীর হাতল স্পর্শ করলেন।

২১

শুধু ভীমসেন নন, পাণ্ডবের পাঁচ ভাইয়ের পাতে আজকাল মাছের ঝোলা না থাকলে চলছে না। ভুসুকুর ইচ্ছে তাঁদের রকমারি মাছের ঝোল রান্না করে পাঠায় কিন্তু পাঁচ ভাই মহাবীর হলে কী হবে— কাঁটা বেছে খাওয়ার ব্যাপারে এখনও দুর্বল। রুই-কাৎলা ছাড়া আর কিছু রান্না করতে সাহস পাচ্ছে না ভুসুকু সে কারণে। প্রতিদিন যে দু-তিনজন মোষে টানা ছোট একটা গাড়িতে রুপোর পাত্র ভরে ঝোল নিয়ে যায় তাঁদের অবশ্য মাছ খাওয়ায় কোনও আগ্রহ নেই। জিগ্যেস করলেই সবিনয়ে বলে, ‘আমাদের এসব খাওয়া নিষিদ্ধ।’

যজ্ঞের ক’টা দিন মাছ রাঁধার সময় হবে না বলে ভুসুকু সংবাদ পাঠিয়েছিল। এতে ভীমসেন দুঃখিত হয়ে একজন রাজরাধুনিকে আজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে মন দিয়ে ভুসুকুর রান্না পর্যবেক্ষণের পর মাথা নাড়িয়ে বলল, ‘পদ্ধতি অতি সহজ। কিন্তু আঁশ ছাড়ান অভ্যাসের বিষয়। আমাদের রন্ধনশালায় যারা মাংস কাটে, তাঁদের এসে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।’

‘এই ক’দিন মাছ নিয়ে আসবেন। আমি আঁশ ছাড়িয়ে কেটে দেব। তারপর দেখুন পারেন কি না।’

রাজরাঁধুনি খুব একটা উৎসাহিত বোধ করল না কথাটা শুনে। গম্ভীর মুখে বলল, ‘ওই আপনি যেটাকে বলেন ফোড়ন দেওয়া সেটা খুব গোলমেলে। আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বহুমূল্য কাল জিরে পুড়ে গেছে। মহাভাণ্ডারি বলে দিয়েছেন এভাবে মূল্যবান মশলার অপব্যায় হলে তিনি অপারগ।’

‘ঠিক আছে। ঝোল বানাতে হবে না। রাজপুত্রদের কেবল ভেজে দেবেন।’

রাজরাঁধুনি সম্মত হলেন। অনুচরেরা গাড়িতে মাছের ঝোলের পাত্র তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করল। ভুসুকু হাত-পা ধুয়ে কাচা কাপড় পরে আশ্রমের মূল অংশে যাওয়ার উদ্যোগ নিল। ভূতমিত্রের আশ্রমটি অনেকটা জায়গা নিয়ে অবস্থিত। ছাত্রাবাস, গুরুগৃহ, খাদ্যশালা, খাদ্য ভাণ্ডার, কাঠ রাখার জায়গা, ক্রীড়াক্ষেত্র ছাড়াও পঞ্চাশটি গরুর গোয়াল। এর বাইরেও কয়েকটি ঘোড়া আর একটি হাতি। আরও আছে— চাষের খেত, পুষ্করিণী, প্রমোদ উদ্যান, ফলের বাগান। ভুসুকুর ঘর আশ্রমের সীমানা ঘেঁসে। পেল্লায় ফলের বাগানের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। গাছপালায় ঘেরা এই অংশে আরও তিন-চারটি বাড়ি আছে। আশ্রমের দু-তিনজন কর্মচারি থাকে। বাড়িগুলো বেশ দূরে দূরে।

বের হতেই অদত্তকে দেখল ভুসুকু। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছিল। গতকালই তাঁকে পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করতে দেখেছিল। কী কথা হচ্ছিল তা শোনার উপায় ছিল না ঠিকই, কিন্তু অদত্তর আচরণ দেখে ভুসুকু বুঝতে পেরেছিল সে পুন্ডরীকাক্ষের বেশ ভক্ত। আগ্রহের তেমন বিষয় না থাকলে অদত্তর বয়সি ছেলেরা অত মন দিয়ে কিছু শোনে না।

‘কী সংবাদ অদত্ত!’ ভুসুকু ডাকল। অদত্ত বিনয়ের হাসি দিল একটা। ছেলেটি দেখতে ভারি সুন্দর। মনে

হয় হস্তিনাপুরের কোনও রাজপুরুষের সন্তান। এই সব ছেলেদের আত্মবিশ্বাস থাকে।

'আপনি রোজ মাছের ঝোলা রান্না করে কোথায় পাঠান?'

ভুসুকু চিন্তা করল। এই প্রশ্নটা অদ্যাবধি তাঁকে কেউ করে নি। যেহেতু হস্তিনাপুরে মাছ রান্নার চল নেই তাই ভুসুকু অসুর মহলে মাছের ঝোল বিক্রি করে বলেই আশ্রমিকরা জানে। তাঁরা সবাই মাংসাশী। রকমারি মাংস খেলেও মাছ নিয়ে আগ্রহ দেখায় নি। ভুসুকু একটা জিনিস বুঝতে পেরেছে যে প্রকৃত হস্তিনাপুরি বলে যারা নিজেদের দাবি করে, তাঁরা মাছকে অভক্ষ্য মনে করে।

'তুমি জান না?' ভুসুকু উল্টে জিগ্যেস করল। 'মাছের ঝোলা বিক্রি করা আমার উপজীবিকা।'

'উত্তম। আমি আপনার বিষয়ে আগ্রহী।'

'কেন?'

'অসুরদের সঙ্গে মেলামেশার তো সুযোগ তেমন হয় না। আশ্রমে সবাই অনসুর। আপনি ব্যতিক্রম। আমার বাবা হস্তিনাপুরের রাজকীয় সীমান্ত ব্যবস্থার প্রধান। —আচ্ছা, আপনি গেরুয়া পদ্ম দেখেছেন?'

'গৈরিকোৎপল?' ভুসুকু বিস্মিত হল। 'নীলোৎপল, কোকনদ ইত্যাদি দেখেছি। পদ্ম কি গৈরিক হয়?'

'আশ্রম থেকে যা শিখেছি তাতে হয় না। কিন্তু আশ্রমের সীমানাতেই এমন একটি ফুটেছে।'

'কোথায়?'

'সামনেই। ফল বাগানের ঈশান কোণে। চলুন, দেখাচ্ছি। আমি আসার পথেই প্রথম দেখলাম।'

কৌতূহলী ভুসুকু অনুসরণ করল অদত্তকে। বাগানের ঈশান কোণের প্রান্তে যেতে কিছুটা সময় লাগে। এদিকটায় বাগান ফুরিয়া যাওয়ার পর বিরাট একটা মাঠ শুরু হয়েছে। মাঠের খানিকটা আশ্রমের সীমানায় পড়ে। নানারকম ঝোপঝার আর লতাগুল্মে মাঠটা ভর্তি। সেখানে সত্যি সত্যিই পাঁচ ছয় হাত লম্বা একটি গাছে গৈরিকোৎপল ফুটে আছে। একটাই ফুটেছে। কিন্তু তার জৌলুস দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

'অদ্ভুত, না?'

'নিঃসন্দেহে। ভূতমিত্রকে দেখাতে হবে।'

'গন্ধটা অসামান্য! হস্তিনাপুরের শ্রেষ্ঠ ধূপের সুবাস এর কাছে পরাজিত হবে।'

'তাই?'

ভুসুকু হাত বাড়িয়ে ডালটা টেনে নামাল। ফুলটা চলে এল নাকের কাছে। মন দিয়ে লক্ষ্য করল ফুলটাকে। দলগুলি উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের হলেও গোড়ার দিকটা সোনালি। মৃদু সুবাস পাচ্ছিল সে। অদ্ভুত মিষ্টি বাস। ভুসুকু নাক ছোঁয়াল পাঁপড়িতে। গন্ধটা যেন নাক বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল রক্তে।

জ্ঞানহীন ভুসুকু লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এটাই হওয়ার ছিল। অদত্ত নিচু হয়ে ভুসুকুকে একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে শিস্ দিল একটা। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে দুটি ব্যক্তি প্রকট হল এবার। তাঁরা অনায়াসে ভুসুকুকে কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে আশ্রমের সীমানার দিকে চলে গেল। গাছপালার আড়ালে তাঁরা মিলিয়ে যেতেই অদত্ত ছুটল মূল আশ্রমের দিকে। তাঁর কাজ শেষ।

মনে মনে ছোটবেলা থেকেই দুর্যোধনের পরমভক্ত অদত্ত। কিন্তু লালচুলের লোকটার মত কেউ এর আগে দুর্যোধনের রাজা হওয়ার বাস্তবতা নিয়ে তাঁকে বোঝায় নি। লালচুল তাঁকে বুঝিয়েছে যে দুর্যোধনকে সমর্থনের জন্য সবার আগে দরকার ভক্তসঙ্ঘ। সে ব্যাপারে সে সব রকম সহযোগিতা করবে। কিন্তু আশ্রমে কোনও অসুর থাকা চলবে না। ভুসুকুকে তাড়াতে হবে। এর জন্য একটি কাজ করতে হবে অদত্তকে। আশ্রমের একস্থানে ফুটে আছে একটি গৈরিকোৎপল। ভুসুকু যদি একবার সে ফুল শোঁকে, তবে মূর্ছা যাবে। তখন তাঁকে আশ্রম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। পরে কী হবে, সে নিয়ে অদত্তের ভাবার দরকার নেই।

অদত্ত কথা রেখেছে। গৈরিকোৎপল কী ভাবে ফুটল, তা সে জানে না। কিন্তু যাঁরা ফুটিয়েছে তাঁদের ক্ষমতা আছে বটে! ফুলটা যদি মায়া হয় তবে সন্দেহ নেই লালচুল উচ্চাঙ্গের মায়াবী।

'এই যে অদত্ত!' কে জানি ডাকল। অদত্ত একমনে ছুটছিল। থমকে দাঁড়িয়ে দেখে সুবন্ধু। তাঁর সতীর্থ। সে একমুখ হেসে জিগ্যেস করল, 'দৌড়োচ্ছিস যে? কিসের তাড়া?'

'ভুসুকুকে খুঁজছিলাম।'

'আরে সবাই তো তাঁকেই খুঁজছে। গুরুদেব

জ্ঞানহীন ভুসুকু লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এটাই হওয়ার ছিল। অদত্ত নিচু হয়ে ভুসুকুকে একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে শিস্ দিল একটা। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে দুটি ব্যক্তি প্রকট হল এবার। তাঁরা অনায়াসে ভুসুকুকে কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে আশ্রমের সীমানার দিকে চলে গেল। গাছপালার আড়ালে তাঁরা মিলিয়ে যেতেই অদত্ত ছুটল মূল আশ্রমের দিকে। তাঁর কাজ শেষ।

স্বয়ং খুঁজছেন। একটা গাছ ওপড়াতে হবে। হাতিটা লাগবে।'

অদত্ত দেরি করল না। এমন ভাব করল যেন ভুসুকুর কী হয়েছে সে জানে না। সুবন্ধুকে নিয়ে ছুটল আশ্রমের দিকে। গৈরিকোৎপল কিছুক্ষণ সময় ধরে ফুটে থাকবে। এই অবস্থায় ঈশান কোণের দিকে কাউকে যেতে না দেওয়াই ভাল।

আধা দণ্ড পর মধুক্ষরা এল ভুসুকুর সন্ধানে। আশ্রমে যজ্ঞের আয়োজন দেখার জন্য সে সখিদের নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভুসুকুকে সবাই মিলে খুঁজছে দেখে সে একটু অবাক হয়েছিল। আশ্রমের বাইরে গেলে দ্বারপ্রহরীর কাছে সংবাদ থাকত। তা ছাড়া যজ্ঞের আয়োজন চলছে বলে ভূতমিত্রের নির্দেশ ছাড়া সে আশ্রমের বাইরে যাবেই না। তাই ভুসুকুকে খুঁজে না পাওয়ার সংবাদে সে একটু চিন্তিত মনেই গেল তাঁর বাড়ির দিকে। ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক খোঁজার পর নিশ্চিন্ত হল যে ভুসুকু বেরিয়েছে। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়?

তখনই তীক্ষ্ণ আর জোরাল একট স্বর এসে ঢুকল তাঁর কানে। —আঁ আঁ আঁ!

হাতিটা ডাকছে।

মধুক্ষরা দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল হাতিটা তাঁর দিকে ঘুরে শুঁড় নাড়াচ্ছে। তাঁকে ডাকছে?

ধীরে ধীরে হাতিটার সামনে এল মধুক্ষরা। হাতিটা এবার শুঁড়টা ঘুরিয়ে ডাকল। এই ডাকটা তেমন জোরে নয়। মধুক্ষরার মনে হল হাতিটা শুঁড় দিয়ে বাগানের ঈশান কোণটা দেখাচ্ছে। সে সেদিকে হাত তুলে হাতিটাকে জিগ্যেস করল, 'ওদিকে?'

হাতিটা মৃদু শব্দ করল। মধুক্ষরার মনে হল সে বলল, 'হুঁ।'

একটু ভেবে নিল মধুক্ষরা। ভুসুকু অনেকবার তাঁকে বলেছে যে হাতি হল বুদ্ধিমান প্রাণী। অনেক কিছু বোঝে। সে কি ভুসুকুকে ঈশান কোণে যেতে দেখেছে? ওদিকে বাগান শেষে হওয়ার পর বিরাট একটা মাঠের মত আছে বলে শুনেছে মধুক্ষরা।

বাগানের মধ্যে দিয়েই একাধিক কাঁচা পথ এদিক ওদিক চলে গেছে। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে আশ্রমিকরাই পথগুলো বের করেছে যাতে বাগানের মধ্য দিয়ে এদিক ওদিক সহজে যাওয়া যায়। মধুক্ষরা অনুমানের ভিত্তিতে ঈশান কোণের দিকে হাঁটতে লাগল। বাগানটা বিরাট। ঈশান কোণের সীমানায় পৌঁছাতে সময় লাগল মধুক্ষরার। বাগানের সীমানা বরাবর একটু চওড়া পথ। এই পথটা বাগানটাকে ঘিরে রেখেছে। পথের ওপাড়ে ঘন ঝোপঝাড়ের সারি। সে সব টপকে মাঠে ঢোকা বেশ কঠিন। নিশ্চয়ই সহজ একটা উপায় আছে মাঠে ঢোকার!

একটু এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করে মধুক্ষরা দেখল একটা জায়গায় ঝোপঝাড় নেই। ছয়-সাত হাত লম্বা অংশ পরিষ্কার করে কাটা। মধুক্ষরা এবার মাঠে পা রাখল। হরেক লতাগুল্ম আর ছড়ানছেটান গাছপালায় মাঠটা আবৃত। তার মধ্যে মধুক্ষরার চোখে পড়ল একটা জায়গা বেশ ফাঁকা আর পরিষ্কার। সেদিকেই পা বাড়াল সে।

মাঠের এই জায়গাটা সত্যিই বেশ পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট গাছ আর লতাপাতায় চারদিক ঘেরা। কোনও বিশেষ কারণে আশ্রমিকরা স্থানটি পরিষ্কার করে রেখেছে। মধুক্ষরা চারদিকে তাকাল।

গেরুয়া পদ্মফুলটা তখনই চোখে পড়ল তাঁর। প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। গৈরিকোৎপল অসম্ভব! হস্তিনাপুরে রকমারি পদ্মবন আছে। ধনীগৃহে পদ্মসরোবর তো থাকেই, বাগানে পদ্মবনও থাকে। সুতরাং মধুক্ষরা থমকে দাঁড়াল। যে গাছটা থেকে ফুলটা ঝুলছে সেটার পাতা মোটেই পদ্মগাছের মত নয়। ওই রকম ছোট ছোট পাতা পদ্মপর্ণ হতেই পারে না। তাহলে?

সন্তর্পণে এক পা করে গাছটার দিকে এগোতে থাকল মধুক্ষরা। কিন্তু গাছটার কাছাকাছি আসার আগেই মাটিতে পড়ে থাকা একটা জিনিস তাঁকে থামিয়ে দিল।

বেশ কয়েক হাত দূরে পাতায় মোড়া মাছভাজা।

ভুসুকু কোচরে মাছভাজা রাখে মাঝেমধ্যে। সে ছাড়া এই ভাজা এখানে আর কারোর কোচর থেকে পড়তে পারে না। তার মানে ভুসুকুএসেছিল এদিকে! তারপর গেল কোথায়?

মধুক্ষরা কপালে ভাঁজ পড়ল। কালবিলম্ব না করে সে দৌড়োল উল্টো দিকে। ভুসুকু বলেছিল সে বাইরে বের হলে দু'জন রক্ষী তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে অনুসরণ করে। তাঁরা নিশ্চই এখন আশ্রমের বাইরে কোথাও আছে। কিন্তু মধুক্ষরা তাঁদের চিনবে

কী করে?

চেনা নিয়ে সমস্য হল না। খানিকটা দৌড়োবার পর মধুক্ষরা দেখল দু'জন ঘোড়সওয়ার বায়ুবেগে এদিকেই ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে তাঁরা মধুক্ষরার সামনে এসে লাগাম টানল। ঘোড়া দুটো সামনের পা সামান্য তুলে থেমে গেল বাধ্য ছেলের মত।

'ভুসুকুবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে তাঁকে দেখলেন কি?'

একজন সওয়ার জিগ্যেস করল। মধুক্ষরা হাঁফাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, 'আমাকে এক্ষুনি যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে চলুন! আমার ধারণা ভুসুকু বিপদে পড়েছে।'

সওয়ার দু'জন অভিজ্ঞ রক্ষী। মধুক্ষরার চোখমুখ দেখে তাঁরা বুঝে নিল বিষয়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মধুক্ষরা তাঁদের সঙ্গে যাবে কী ভাবে?

'আপনি আমাদের অনুসরণ করে যুবরাজের কাছে পৌঁছে যেতেই পারেন ভদ্রে! কিন্তু আপনি কি অশ্বচালনায় প্রশিক্ষিত?'

'আশ্রমে অতিরিক্ত রথের অভাব নেই।' মধুক্ষরা জবাব দিল।

'সারথি?'

মধুক্ষরা কোনও জবাব না দিয়ে দৌড়ল রথের খোঁজে। রক্ষী দু'জন একটু বিস্মিত হয়ে অনুসরণ করল তাঁকে। তাঁদের বিস্ময় সীমাহীন হয়ে গেল যখন দেখল একটি দুই ঘোড়ার রথ চালিয়ে মেয়েটা আশ্রম থেকে বায়ুবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'ওহে দু'ঘোড়ার রথ !শিগগির! মেয়েটা রথটাকে রাজপুরুষের মত ছোটাচ্ছে।'

হস্তিনাপুরের পথঘাটকে চমকে খটাখট শব্দে একটা রথ ছুটল। তাঁর সারথি একটা মেয়ে। একটু পেছনে দুই ঘোড়সওয়ার। ব্যাপারটা বেশ উত্তেজিত করে তুলল হস্তিনাপুরিদের।

২২

সারা দিন নিজের মহল থেকে আজ বাইরে আসেন নি দুর্যোধন। শরীরচর্চা করলেও সকালে সেটা মহলের ব্যায়ামাগারেই করেছেন। মহলের নিরাপত্তা প্রধান শল্যবাহন তাই অন্য কোথাও যেতে পারছেন না। রাজপুত্রেরা সাধারণতঃ সারা দিন নিজের মহলে থাকেন না। তাঁদের রকমারি কাজ থাকে। অনেক কিছু শিখতে হয়। বেলা দ্বিপ্রহর গড়ালে তাঁরা অবকাশ পান। তখন একবার মহলে আসলেও আসতে পারেন। দুর্যোধন সকাল থেকে নিজের মহলে বসে আছেন, এটা খুব বিরল ব্যাপার। মনে হয় লালচুলের লোকটার সঙ্গে কিছু একটা শলা করছে।

পুন্ডরীকাক্ষকে এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি শল্যবাহন। দুর্যোধনের বন্ধু হওয়া যে সে কথা নয়। সুতরাং পুন্ডরীকাক্ষের মধ্যে কিছু একটা তো আছেই! সে যে শক্তিশালী যোদ্ধা— এ নিয়েও সংশয় নেই। কোমরে যে তরোয়ালটা ঝোলে সেটা চালনা করা যার তাঁর কাজ নয়। কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্যটা কী? একেও কি কর্ণের মত রাজা বানিয়ে দেবেন দুর্যোধন?

একটা রথ এসে থামল। শল্যবাহন দেখলেন চরমণি নামছে। তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। চরমণি পাশে বসল। শল্যবাহন দেখলেন তাঁর মুখ নিষ্প্রভ।

'কী একটা বাজে পুরনো রথ নিয়ে ঘুরছেন?' শল্যবাহন হালকা গলায় বললেন। 'দুর্যোধনের গুপ্তচর হিসেবে আপনার উপার্জন তো খারাপ হওয়ার কথা নয়! নতুন যে উচ্চগতির রথগুলো বেরিয়েছে তা আপনি অনায়াসেই কিনতে পারেন!'

'তা পারি।' চরমণির স্বর বিষণ্ণ শোনাল। 'তবে দুর্যোধন আমার কাছ থেকে আর সংবাদ জানতে আগ্রহি নন। বেতন ঠিকই পাচ্ছি, কিন্তু গুরুত্ব নেই। মনের দিক থেকে তাই অবসন্ন হয়ে গেছি মহাশয়!'

'সে কী কথা!' শল্যবাহন উৎসাহ বোধ করেন। 'দুর্যোধন তবে গুপ্তসংবাদ পাচ্ছেন কোত্থেকে?'

'লালচুল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে চরমণি। 'তিনিই তো এখন তাঁর সব কিছু। অথচ লোকটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারি নি।'

'কিছুই না?'

'সত্যি বলতে একদম যে জানি নি তা নয়।' চরমণি এবার একটু উজ্জীবিত বোধ করে। 'লোকটা থাকে বিদেশি পাড়ায়। একটা উচ্চ প্রাকার বিশিষ্ট বাড়িতে।'

'সে তো গোটা হস্তিনাপুর জানে।'

'সাগরদেশের দূতাবাসে তাঁর যাওয়া আসা আছে।'

'বটে!' শল্যবাহন ভুরু কোঁচকালেন। 'এই সংবাদটা জানতাম না।'

'সেই দূতাবাসে সে কখনও কখনও গভীর রাতে যায়।'

'এই তথ্যটা কি গুরুত্বপূর্ণ?'

'কেন?' চরমণি ঠিক বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করে।

'এই ধরনের জমকাল ব্যক্তিত্ব হস্তিনাপুরের নৈশজীবনে অভ্যস্থ থাকবেন এতে আর অভিনবত্ব কী?'

'তা হলে কোনও পাশাচক্রে কি প্রমোদোদ্যানে কি রঙ্গশালায় যাবে। সাগরদেশের দূতাবাসে কী এমন মধু আছে?'

'সেটাও ভাবার মত প্রশ্ন।' শল্যবাহন থুতনিতে আঙুল বুলিয়ে বললেন। 'সাগরদেশ কী রকম দেশ?'

'তুচ্ছ একটা দেশ। শুনেছি রাবণরাজ্যের কাছাকাছি কোথাও। ক্ষুদ্র একটি দ্বীপদেশ হবে!'

'সে দেশ কি লালচুলোর নিজের দেশ বলে মনে হয়?'

'তাই যদি হবে তবে দূতাবাসের যারা থাকেন তাঁদের কারোর চুল লাল নয় কেন?'

'দূতাবাসের ভেতরের তথ্য আপনি জানেন?' শল্যবাহনের প্রশ্নে প্রশংসার সুর শোনা গেল। দুর্যোধনের প্রিয় সখা হিসেবে লালচুলোকে রাজবিধি মান্য করতে হবে। খুব শক্তিমান অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনও দেশের দূতাবাস না হলে দুর্যোধনের মত রাজপুরুষ বিনামন্ত্রণে যেতে পারেন না। সেই আচরণবিধি লালচুলোকেও মেনে চলতে হবে। দুর্যোধন কি জানেন যে তাঁর বন্ধু সাগরদেশের মত তুচ্ছ একটা দেশের দূতাবাসে যখন তখন গিয়ে থাকেন?

চরমণির উত্তর অবশ্য শোনা হল না। শল্যবাহন দেখলেন একজন অশ্বারোহী দ্রুত ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। তাঁকে ইশারায় থামতে বলে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'এটা সংরক্ষিত এলাকা। অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া ঘোড়া ছোটান নিষিদ্ধ। আপনাকে বন্দি করতে পারি!'

অশ্বারোহী শান্ত গলায় বললেন, 'আগে যুবরাজ দুর্যোধনকে গিয়ে বলুন মৃগয়াক্ষেত্র পাওয়া গেছে।'

শল্যবাহন রক্ষিদের নির্দেশ দিলেন অশ্বারোহীকে দেখে রাখতে। তারপর ছুটলেন প্রাসাদের ভেতরে। দুর্যোধন শান্ত ভাবে একটি কক্ষে বসে তালবাদ্য সহযোগে নৃত্য উপভোগ করছিলেন। কিন্তু সংবাদটি পাওয়ার পর তাঁর চোখেমুখে চাঞ্চল্য ফুটে উঠল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। প্রাসাদে তাঁর অনুচর-ভৃত্যের দল এতক্ষণ ঝিমোচ্ছিল। ঢং ঢং করে ঘণ্টার শব্দে লাফিয়ে উঠল সবাই। ঘণ্টার শব্দ বলে দিচ্ছে দুর্যোধন বাইরে বের হচ্ছেন।

চরমণি দেখলেন কয়েকজন কালো বস্ত্র পরিহিত সেনা কালো ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরা কুরু সেনাবাহিনীর সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা— কৃষ্ণবাহিনী। এদের মুখ ঢাকা থাকে। কেবল চোখ দুটি দেখা যায়। বোঝাই যাচ্ছে তাঁরা এখানে এসেছে দুর্যোধনের ইচ্ছায়। কিন্তু এই দক্ষ যোদ্ধাদের নিয়ে দুর্যোধন কোথায় যাচ্ছেন?

দুর্যোধন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। একটি রথ এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি তাতে উঠতেই কৃষ্ণবাহিনীর সদস্যরা রথের পেছনে সারিবদ্ধ হল। বার্তাবাহী অশ্বারোহীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করতেই সে ছুটতে শুরু করল। বোঝা গেল সে পথপ্রদর্শক। নগরির পথঘাটে প্রভূত উত্তেজনা আর গুজব ছড়িয়ে দুর্যোধনের বাহিনী বেরিয়ে গেল হস্তিনাপুর ছেড়ে উত্তর দিকে।

শল্যবাহন নিশ্চিন্ত হলেন। এবার একটু বাড়িতে গিয়ে নিদ্রা যাবেন। দুর্যোধন বেরিয়ে যাওয়ার পর চারদিক আবার চুপচাপ। সামনেই একটি অনুচ্চ কাঠের খুঁটির মাথায় বসান বাঘের মুখ থেকে জল পড়ছিল। শল্যবাহন শীতের মধ্যেও চোখেমুখে জল ছিটিয়ে কিছুটা পান করলেন। চারদিক শান্ত হয়ে এল তাঁর কাছে।

পরক্ষণেই সামনের পথ দিয়ে বায়ুবেগে ছুটে গেল একটি দুই ঘোড়ার রথ! সারথি একজন মহিলা! তাঁর পেছনে ছুটছে দুই অশ্বারোহী। চমকিত শল্যবাহনের মনে হল তাঁরা রাজকর্মি। তবে কি তাঁরা রথটিকে তাড়া করছেন? তা হলে আরও কয়েকজন অশ্বারোহীও সেই কাজটা করত। ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেত। পথ অবরোধ করা হত। রথটি ধরা পড়ে যেত এতক্ষণে।

শল্যবাহন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কী সব ঘটছে আজকাল হস্তিনাপুরে! হতে পারে যা দেখা গেল তা হস্তিনাপুর সেনার নারীবিভাগের অনুশীলন। সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রধানদের অন্ধকারে রাখার কোনও মানে হয়?

তিনি চরমণির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কিছু বুঝলেন?'

'যে ভাবে গেলেন তাতে মনে হয় কোনও বীরাঙ্গনা হবেন। রাজপুরীতে তো ক্ষত্রিয় কন্যার অভাব নেই!'

'নারী বাহিনীতে অশ্বারোহী আছে, সারথি নেই। সংক্ষেপে শুনে রাখুন সারথি মহিলাটি যে ভাবে রথ চালিয়ে গেল তা হস্তিনাপুরে সুলভ নয়। মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন আছেন তাঁরা এই পথ দিয়ে যাতায়াতের বিধি নিষেধগুলি জানেন।'

চরমণি একটু চিন্তা করল। ব্যাপারটা দর্শনীয় হলেও স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক নয় মানেই

ভারসাম্যের অভাব ঘটছে। তার মানে গন্ডগোল হতেও পারে। যদিও দুর্যোধন এখন তাঁকে পাত্তাই দিচ্ছেন না, তা বলে কি সংবাদ সংগ্রহ বন্ধ রাখা যায়?

‘কী ভাবছেন এত?’

চরমণি ভাবিত স্বরে জিগ্যেস করল, ‘একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?’

‘উত্তরের প্রতিশ্রুতি অসম্ভব।’

‘আমি কি আমার জন্য আমাকে গুপ্তচর রূপে নিয়োগ করতে পারি?’

দু’পলক থমকে থেকে শল্যবাহন মৃদু হাসলেন। দুর্যোধনের নিরাপত্তার অঙ্গ রূপে তিনি কোথায় যাচ্ছেন তা জেনে রাখা তাঁর কর্তব্য। সম্প্রতি দুর্যোধন তাঁর গতিবিধি গোপন রাখতে পছন্দ করছেন। সেটা ঠিক হচ্ছে না। বৃহত্তর হস্তিনাপুর নগর বিশাল ও বিস্তৃত। গোপনে চলাচল করা সহজ। লালচুলের ক্ষেত্রে দুর্যোধন স্বেচ্ছাচারি পদক্ষেপ নিচ্ছেন। লোকটার চুল লাল এবং সে শক্তিশালী যোদ্ধা। কিন্তু দুর্যোধন মোহিত হয়েছেন অন্য কোনও গুণে।

চরমণিও এই ব্যাপারে একমত হবে শল্যবাহনের সঙ্গে। লালচুলের কিছু একটা আছে যা সে জানে না। লোকটার পরিচয় স্পষ্ট নয়। চরমণি যতটুকু জেনেছে তাতে লোকটা বিদেশি পাড়ায় থাকলেও মেলামেশা করে অল্প কয়েকজনের সঙ্গে। চরমণির দৃঢ় বিশ্বাস লালচুলের অন্য একটা পরিচয় আছে। সেটা সে গোপন করে রাখে।

‘আপনি নিজের গুপ্তচর রূপে নিজেকে যা তথ্য দেবেন তা যদি আমায় জানাতে পারেন তবে উপকৃত হব।’

জানিয়ে দিলেন শল্যবাহন।

তখন দুর্যোধন কৃষ্ণযোদ্ধাদের সঙ্গে নগরের এক প্রান্তে। একটি মহিষে টানা সুসজ্জিত গাড়ি। ভেতরে বিছানায় এক ব্যক্তি ঘুমোচ্ছে। গাড়িটি একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল দুর্যোধনের অপেক্ষায়। তিনি ঘুমন্ত ব্যক্তিটিকে নিরাপদে নগরি থেকে বেশ কয়েক যোজন দূরে একটি গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ রক্ষী দেবেন। কয়েক যোজনের পথটা যমারণ্যের মধ্য দিয়ে। বিকল্প পথটায় দূরত্ব কয়েক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু সেটাই মূল পথ। যমারণ্য বিপদজনক অঞ্চল। বেশ কয়েকটি দস্যুদল সেখানে রাজত্ব চালায়। হস্তিনাপুরকে খুব যে মান্য করে, তা-ও নয়। তবে তাঁরা যমারণ্যের বাইরে আসতে চায় না বলে ভীষ্ম তাঁদের বিরক্ত করার পক্ষপাতী নন। বিনিময়ে দস্যুরা কথা দিয়েছে যে হস্তিনাপুর আক্রান্ত হলে তাঁরা পাশে থাকবে।

তাই যমারণ্যের পথ ব্যবহার করলে নিরাপত্তায় ফাঁক রাখা চলবে না। পুন্ডরীকাক্ষও জানেন যে অঙ্গরাজের কৌশল কাজে লাগিয়ে ভুসুকুকে অচেতন অবস্থায় তুলে আনা হয়েছে। এবার ভুসুকুকে পালাতে দেওয়া চলবে না। দুর্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অঙ্গরাজ অঙ্গার ভুসুকুকে অপহরণ করা উচিত বলে মনে করেন। তিনি মায়াফাঁদ পাতেন। তাঁর নির্দেশ ছিল ধরা পড়া মাত্র ভুসুকুকে যেন যমারণ্যের মধ্য দিয়ে দ্রুত নিকুমভিলা গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই ভুসুকুর পূর্ণ সম্মোহন সম্পন্ন হবে। এর ফলে ভুসুকু হয়ে উঠবে দুর্যোধনের জোরদার সমর্থক। সে চলবে অঙ্গরাজের নির্দেশে।

বাকিটা ভুসুকুর একই থাকবে।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক থ্রিলার। শেষ পর্ব

মরা মৌমাছির চোখ

সাগরিকা রায়

রক্তের ধারায় কার ঈর্ষার ছাপ খুঁজে পেল জবালা? সে কে? নাকি সব সন্দেহের আড়াল সরিয়ে এক নিষ্পাপের কান্না শোনা যায়? মৃত্যুর পথ এক জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে অবিরাম। অবশেষে...!

২৩

সিগারেট বা কড়া কফি কোনওরকম নেশা নিয়ে বসে চিন্তা করার লোক কৃপাসিন্ধু নয়। বরং একা ঘরে বসে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসে ও। আর এভাবেই অতল থেকে তুলে এনেছে মণিমুক্তো। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার চেয়ে বুদ্ধিটাকে স্থির হতে দিতে পছন্দ করে ও। ঘর অন্ধকার করে একমনে বসে থাকলে অনেক কঠিন জট সহজে খুলে যেতে দেখেছে। আজও সেভাবে বসেছিল। দরকার ছিল কয়েকটি খবরের। আশা করা যাচ্ছে এ বেলার মধ্যে সেসব খবর পাওয়া যাবে। একটা জট এমন জায়গায় রয়েছে যে দেখা যাচ্ছে না, অথচ সবকিছুর মূল সেখানে। পরিবারের সদস্যদের জবানবন্দী নেওয়া হয়ে গেছে। বংশের যে বিশাল শাখা প্রশাখা রয়েছে, সেখানে হানা দেওয়া দরকার। তবে সেখানে কতটা কী পাওয়া যাবে, সেটা সন্দেহ।

সুখময় সরকারের অর্থভাগ্যের প্রতি কেউ তুষ্ট নয় এটা দেবব্রর থেকে জানা গেছে। কথা সত্যি। নাহলে কেউ পরিবারের সহায়ক হয়ে এগিয়ে আসছে না কেন? একজন আছেন। তিনি বটবৃক্ষের মত আগলে রেখেছেন পরিবারটিকে। তিনি সুখময়কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

"স্যার! একজন এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"কে?"

"বললেন, সরকার বাড়ির মৃত্যুর ব্যাপারে কথা বলবেন।"

বাইরের ঘরটিতে বসেছেন ভদ্রলোক। অভিজাত চেহারা। সৌম্যকান্তি।

"নমস্কার। আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি সরকারবাড়ির অন্যতম শরিক। আমার নাম মানসরঞ্জন সরকার।"

"ওহ। আচ্ছা। বলুন।"

"আমি জানি না শুভর মৃত্যুর বিষয়ে কোনও সাহায্য করতে পারব কিনা। তবে কিছু কথা ছিল। আমি অকৃতদার। দেখাশোনা করে একটি ছেলে। রান্নার লোক আছে। সুখময় আমার বন্ধু ছিল। কেবল আত্মীয় বললে ভুল হবে। ওর মৃত্যুতে আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি, প্রকাশ করতে পারব না। মরে যাবে, চলে যাবে, অথচ একবার সেকথা বুঝতে দেয়নি। কিন্তু ও যে আত্মহত্যাই করেছে, সেকথা আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না। এটা একটা দুর্ঘটনা। নেশা ওকে পেয়ে বসেছিল। তীব্র নেশায় আচ্ছন্ন ছিল। বাড়িতে থাকলেও নেশা ছাড়া থাকতে পারতো না। সেই নেশার ঝোঁকে ও তাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায় ছাদ থেকে! কী ভয়ংকর!"

"আর শুভব্রতর খুন সম্পর্কে কী বলবেন?"

"খুন হয়েছে শুভব্রত অর্থের জন্য। অর্থই সবের মূলে।"

"আপনি কী মীন করছেন?"

"খুঁজুন অফিসার।" হাসলেন মানসরঞ্জন।

উনি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। দীর্ঘ চেহারা। লালচে টকটকে রঙ। সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা বিষণ্নতা ছেয়ে আছে!

"একটা কথা জানতে পারি?" পেছন থেকে ডাকল কৃপাসিন্ধু, "নেহাতই কৌতূহল। আপনি সুপুরুষ, যথেষ্ট ধনী, বিয়ে করলেন না কেন?"

"বিয়ে?"একমুহূর্ত দাঁড়ালেন মানসরঞ্জন। তারপর প্রশ্নটা হৃদয়ঙ্গম করেই যেন হাসলেন, "সুপুরুষ এবং ধনী হলেই কি বিয়ে করার যোগ্যতা থাকে? সকলের বোধহয় থাকে না। ধরুন, আমিও তেমনই একজন অযোগ্য ব্যক্তি!" হাসিটা ঠোঁটে নিয়ে চলে যাচ্ছেন মানসরঞ্জন। খাঁচার টিয়ের মত হাসিটা চঞ্চল।

২৪

রাতে বিছানায় শুয়ে কিছু হোমওয়ার্ক করছিল কৃপাসিন্ধু। এসব ওর নিজস্ব পদ্ধতি। কেসটি সম্পর্কে ওর নিজ ধ্যানধারণার একটা নিখুঁত বিশ্লেষণ করাই অবশ্য উদ্দেশ্য। পরিষ্কার ধারণা হয় এতে।

আজ বিকেলে দত্ত এসেছিল। কিছু খবর নিয়ে এসেছিল কৃপাসিন্ধুর চাহিদামতো। ফলে অনেকটা এগিয়েছে কৃপাসিন্ধু। তবু আর একবার যেতে হবে সরকার বাড়িতে। আরও কিছু জানার আছে। বোঝারও। আরও জানার আছে। রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে যতক্ষণ না একটা স্থির মীমাংসা পৌঁছান যাচ্ছে, অকুস্থানের আশেপাশে যারা ছিল বা আছে তাদের প্রত্যেকের ওপর সন্দেহ আসবে। তাদের স্বভাব চরিত্র, গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত কেসটি মীমাংসা করা যায় না। একজন দোষীকে শাস্তি দেওয়ার আগে দেখতে হবে যেন ভুল করে কোনও নির্দোষকে শাস্তি না দেওয়া হয়!

একটা ছক কেটেছিল কৃপাসিন্ধু। যোগিন, পাড়ার লোক, কিডনি চোরদের ব্যাপার... এসব সত্যি না মিথ্যে? প্রত্যেকের কথার মধ্যে অসঙ্গতি আছে। কখনও যোগিন বলছে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শেষরাতে, কখনও বলছে বেলা এগারোটায়। বেলা এগারোটার কথা বলেছিল ম্যানেজার। যদি ম্যানেজারের কথা মেনে নিতে হয়, তাহলে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হওয়ার মাঝে কয়েক ঘণ্টা যোগিন কোথায় ছিল? ও কি সত্যি শেষরাতে পালিয়েছিল খারাপ লোকদের হাত থেকে?

আবার যোগিনের পাড়ার লোক সুরেন বর্মণ। আবার ব্রজেনের জামাইবাবু সুরেন বর্মণ। দুজনেই কি এক?

লোকটি লোক ধরে ধরে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে আসছে! ম্যানেজার যখন হরিদ্বারে যান, তখন ওদের সঙ্গে জুটে গেল নীলম। অর্থাৎ সরকার বাড়িতে চলে এল তিনটা লোক। সকলেই এল ম্যানেজারের মাধ্যমে! কথা হল, এরা এল কেন এই বাড়িতে? উদ্দেশ্যটা কী?

পদ্ম— আড়াল থেকে কথা শুনতে আগ্রহী। অনেক খবর রাখে। ব্রজেনকে পছন্দ করে।

জনার্দন, ম্যানেজার-মালিকদের সম্পর্কে ক্ষোভ আছে কি? ক্ষোভ প্রকাশে ভয় আছে? চাকরি হারানোর ভয়? যোগিন, ব্রজেন এবং নীলমকেও জনার্দন বাড়িতে নিয়ে আসেন!

দেবব্রত-সুবর্ণা। উচ্চাকাঙ্খী। ম্যানেজারের সামনে থেকে হিসেবপত্র লুকোতে চান। ব্যবসার ক্ষেত্রে দেবব্রতর ছয়জন স্টাফ আছে, যারা বাইরে থাকে। ওই বাড়িতে থাকে না। তাদের ভাল মাইনেপত্র দেন দেবব্রত। হাজব্যান্ড-ওয়াইফ অন্তরঙ্গ। একাত্মা। মানসরঞ্জন স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু শুভর মৃত্যুর জন্য কাকে দায়ী করেন? কাকে সন্দেহ করেন? কার কথা আভাসে বলে গেলেন? সেই ইঙ্গিত দিতেই কি এখানে এসেছিলেন?

এরপর থাকছে নীলম। মন বোঝা যাচ্ছে না। এল কেন এ বাড়িতে? কী চায়? কোথা থেকে এসেছে? সত্যি কি হরিদ্বারেই ছিল? এই ঘটনাগুলো কি কাকতালীয়? নাকি প্রি-প্ল্যানড? প্রি-প্ল্যানড হলে সেটা কেন?

আবার মানসরঞ্জন এই পরিবারের হিতৈষী। আগে নাকি শরিকি ঝামেলায় যুক্ত ছিলেন! অকৃতদার। একজনকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এই সন্দেহ কি কেবল ক্ষোভ থেকে?নাকি সত্যি কোনও যুক্তি আছে?

ঘুম পাচ্ছে। কৃপাসিন্ধু আলো নিভিয়ে দিল।

২৫

কৃপাসিন্ধুকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল পদ্ম, "আপনি?"

"এসেছিলাম এদিকে। ভাবলাম দেখা করে যাই। আচ্ছা, তুমি তো এবাড়ির সবচেয়ে বুদ্ধিমতী। তুমি মনে করে দেখ তো সুখময়বাবু যেদিন মারা গেলেন, ঠিক কী কী হয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়?"

"বাহ! মনে থাকবে না? এই তো সেদিনের কথা! সবে দুটো আলুর চপ খেয়েছি, গলা জ্বালা করে উঠল। ভাবলাম, যাই, বড়মণির ঘরে ওষুধ থাকে। চেয়ে খাই। কেবল যাচ্ছি, অমনি হৈ হৈ কাণ্ড! গিয়ে দেখি, বড়বাবু উপুড় হয়েও নয়, আবার চিৎ হয়েও নয়, তেরছা হয়ে পড়ে আছেন! মাথাটাথা ফেটে... উহ, কী রক্ত! রক্তমাখা মুখ! কী যেন বলে উঠলেন! বড়মণি চিৎকার করে দৌড়ে বড়বাবুর কাছে যেতে ফের কী বললেন!"

"কী?"

"ঘড়ঘড় করে জড়িয়ে জড়িয়ে... মধু মধু বলে উঠলেন।"

মধু! মৃত্যুর মুহূর্তে মন্ত্রোচ্চারণ? মধুবাতাঋতায়তেমধুক্ষরন্তি...। কী বলতে চেয়েছিলেন? পদ্ম ঠিক শুনেছিল?

"মদ বলেছিলেন মনে হয় আমার! মদের নেশা করেই তো পড়ে গিয়েছিলেন ছাদ থেকে!" পদ্ম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে কৃপাসিন্ধুর ভাবগতিক বোঝার চেষ্টা করছিল।

"ধুস, বাবু তো মাদ্দ মাদ্দ বলছিল। কথা পরিষ্কার ছিল নাকি?" কখন এসে দাঁড়িয়েছে ব্রজেন।

"তাতো হবেই। মরে যাচ্ছেন, তখন কি আর অত সাফ কথা আসে? কথা জড়িয়ে যাবে।" পদ্ম উদাস চোখে তাকায়।

"আচ্ছা ব্রজেন, ক'বার ভূত দেখেছ?" কৃপাসিন্ধু আলগা করে কথা ছুঁড়ে দিল।

"একবারই বাবু। সদর দরজায় যেন বড়বাবুকে দেখেছিলাম একদিন।" ব্রজেন সেকথা মনে করে শিউরে উঠল।

"আমিও দেখেছি বড়বাবুকে। যেখানে পড়েছিলেন, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। উরি বাবারে! গায়ে কেমন কাঁটা দিয়েছে দেখুন!" পদ্ম হাত সামনে এগিয়ে দিল।

"কী করে বুঝলে যে ওটা বড়বাবুই?"

"বাহ, বুঝব না? অত রাতে উনি ছাড়া আর কে থাকবে ওখানে? আর দেখতেও তাঁর মতই। অন্ধকার হলেও কি? বড়বাবুকে চিনতে পারব না?"

"তুমি অত রাতে ওখানে কী করছিলে?"

"আরে আমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি। তাছাড়া পাশেই বাবুদের যে আত্মীয়রা থাকেন, তাদের বাড়ির বাসন্তীও দেখেছে। কে যেন নড়াচড়া করে প্রায়দিনই। হালকা হালকা দেখা যায়! মাটিতে পা নেই। বাতাসে ভর করে হাঁটছে! উরি বাবারে!"

সুবর্ণা কৃপাসিন্ধুকে দেখতে পেয়ে নেমে আসছিল, "আসুন অফিসার। তদন্ত কতদূর এগলো?"

"হচ্ছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক নয়। এতে আসল অপরাধী চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে।"

"বসুন। চা খাবেন? কফি বলি?"

"ও রসে বঞ্চিত আমি। জল খাওয়ান। আমি আরেকবার ছাদটা দেখব। আপত্তি নেই?"

"আপত্তি থাকার কারণ নেই। চলুন। ওহ, আপনার জল!"

পদ্ম জল নিয়ে এসেছে। অল্প জল খেয়ে সুবর্ণার সঙ্গে ছাদে এল কৃপাসিন্ধু। সুবর্ণা এগিয়ে যাচ্ছিল। একবার কী মনে হতে পেছন ফিরে তাকাল।

কৃপাসিন্ধু একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে! সুবর্ণা অবাক হলেও মুখে কিছু বলল না। একমনে কিছু ভাবতে ভাবতে ছাদের এক কোণ থেকে অন্য কোণে হেঁটে বেড়াল। দু-একবার ঝুঁকে পড়ে কার্ণিশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

"ছাদটা নেড়া রেখেছেন কেন?"

"এইবারে ওয়াল তুলব।" ইতস্তত করে সুবর্ণা।

"সর্বনেশে ছাদ আপনাদের।"

মুখে কথা বলে গেলেও মনে মনে অন্য কথা। ধরা যাক, এইখানটিতে দাঁড়িয়েছিল শুভব্রত। আততায়ী হালকা পায়ে পেছনে এসে দাঁড়াল। তারপরে একটা জোর ধাক্কা! শুভব্রত পড়ে গেল! কিন্তু, একবারও চিৎকারকরবে না? আততায়ীকে শুভব্রত চিনতো কি? হয়ত দুজনে কথা বলছিল! বলতে বলতে শুভব্রতকে পেছন ফিরে দাঁড়াতে হয়েছে। খুনি ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বা ছাদের থেকে মাটিতে কিছু দেখাচ্ছিল! শুভব্রত দেখতে গিয়ে ঝুঁকেছিল, আর তখনই! হতেই পারে! হয়ত বিমূঢ় হয়ে পড়ায় চিৎকার করেনি। কিছু বোঝার আগেই মৃত্যু এসেছিল! কৃপাসিন্ধু কল্পনা করে —যদি এভাবে ধাক্কাটা দেওয়া যায়, তাহলে শুভ উপুড় হয়ে পড়বে। এবং মনে রাখতে হবে পড়ার সময় কোথাও বাধা পাচ্ছে না! আচ্ছা, পড়ছে, তখন একবারের জন্য পেছন ফিরে তাকানোর চেষ্টা করেনি ঘটনার আকস্মিকতায়? কে ওকে ধাক্কা দিল এটা দেখতে চায়নি? বা, যদি আততায়ীর সঙ্গে কথা চলছিল ধরা যায়, তাহলেও কি ও অবাক হয়ে যায়নি? কোনও রিঅ্যাকশন? বাঁচার জন্য কিছু অবলম্বন করে নিজেকে সামলাতে চাইবে না? নীচের দিকে ধরে ফেলার মত কিছু নেই... এটা কী? কার্ণিশের ওপর চকচক করছে সূর্যের আলোয়...!

সুবর্ণা ছাদের চারপাশে লাট্টুর মত পাক খাচ্ছিল। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কৃপাসিন্ধু ছাদের মাঝ বরাবর আসতে সুবর্ণা এগিয়ে এল —হল ছাদ দেখা?

"আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি।"

"আরে ন্না। আপনারা কষ্ট করছেন শুভর খুনিকে ধরতে চেয়ে।" সুন্দর মুখে সুন্দর কথা চমৎকার লাগে। শিল্প যেন। সোনামুখী সূচে কাশ্মীরি সিল্কের ওপর সুতোর কাজ! বিউটি পার্লারের টাচে ঝকঝকে মুখ, ঠোঁট স্বাভাবিক লাল নয়। কৃপাসিন্ধুকে আগেই দেখেছিল। নেমে আসার আগে আয়নার সামনে গিয়েছিল।

"আপনাদের যে বিশাল একটা শরিকি ব্যাপার আছে, তা দেখতে পাচ্ছি। এ ছাদের লাগোয়া ছাদগুলো সবই তো আপনাদের আত্মীয় পরিজনদের? জাস্ট পাশের ...এই যে এটা, ...কাদের?"

"রেখাদের। ওঁর শ্বশুর আমার শ্বশুরের কাজিন। মারা গেছেন। রেখা তাঁর পুত্রবধূ।"

"আর বাঁ দিকের ছাদটা?"

"ওটা প্রীতমদের। এত বিরাট এই শরিকি ব্যাপারটা...! আমি সবাইকে চিনিও না। আমার হাজব্যান্ডও চিনবে না। বোধহয় আমার শাশুড়ি মা-ও চিনবেন কিনা সন্দেহ আছে আমার। কে কার পিসি, কে কার ছোটমামার ভাইয়ের ছেলের নাতির মেয়ে...উফ!"

"আপনার শাশুড়ি মা-এর শরীর কেমন এখন?"

"ভাল নয়। কথাবার্তা বলেন না। আচ্ছন্ন মত...! কান্নাকাটি করেন!" একটা বিষণ্ণতা ছুঁয়ে গেল সুবর্ণার স্বরে।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে কৃপাসিন্ধু ভাবল একবার বড়মণির সঙ্গে দেখা করতে হবে। ভদ্রমহিলা বিরাট আঘাত পেয়েছেন। সন্তান বলে কথা! নাড়ির টান! কষ্ট তো হবেই! অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেদিন যোগিন বড়মণির ঘরে কাকে ঢুকতে দেখেছিল? ঢুকে থাকলে সে গেল কোথায়? যোগিন কি সত্যিকথা বলেছে? তদন্তের চোখ অন্যদিকে ঘোরাতে চেয়েছিল? যোগিন চেয়েছিল? নাকি পেছনে অন্য কেউ আছে?

২৬

দত্ত অপেক্ষা করছিল। খবর আছে। কৃপাসিন্ধুর ফরমায়েশ মত খবর। এতসব খবরের মধ্যে কোনটি ইম্পরট্যান্ট আর কোনটি নয়, বুঝতে চেষ্টা করছিল দত্ত।

কৃপাসিন্ধু ঢুকতেই দত্ত উঠে দাঁড়াল, "কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করেছি স্যার। কাজে আসবে এগুলো।"

আজ বিকেলে দত্ত এসেছিল। কিছু খবর নিয়ে এসেছিল কৃপাসিন্ধুর চাহিদামতো। ফলে অনেকটা এগিয়েছে কৃপাসিন্ধু। তবু আর একবার যেতে হবে সরকার বাড়িতে। আরও কিছু জানার আছে। বোঝারও। আরও জানার আছে। রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে যতক্ষণ না একটা স্থির মীমাংসা পৌঁছান যাচ্ছে, অকুস্থানের আশেপাশে যারা ছিল বা আছে তাদের প্রত্যেকের ওপর সন্দেহ আসবে। তাদের স্বভাব চরিত্র, গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত কেসটি মীমাংসা করা যায় না। একজন দোষীকে শাস্তি দেওয়ার আগে দেখতে হবে যেন ভুল করে কোনও নির্দোষকে শাস্তি না দেওয়া হয়!

"আমি এটা আন্দাজ করেছিলাম। তাই নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছিলাম।"

"তাহলে ব্রজেন...!"

"না।"

"যোগিনকে আপনি...?"

"ওটা ক্রমশ প্রকাশ্য। এখনই নয়।"

উঠল কৃপাসিন্ধু। খবরগুলো পারফেক্ট হলে ভাল। একবার নার্সিং হোমে যেতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে নার্সিং হোমে ঢুকতেই ঝকঝকে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে কৃপাসিন্ধুর মনে হল সবটাই দেখনদারি না হলে মঙ্গল। আসল যে কাজ সেটা ঠিকঠাক হচ্ছে তো?

লিফ্‌ট থেকে নেমে ঠান্ডা প্যাসেজের পর প্যাসেজ পেরিয়ে যেতে যেতে জনমানবের সাড়াশব্দ না পেয়ে ইহলোকে আছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করছিল কৃপাসিন্ধু। পাশ দিয়ে কঠিন মুখ নার্স চলে গেল। দেওয়ালের সাদা রঙের মাঝে মাঝে মহাপুরুষের বাণী খোদাই করা। বড়মণি বসেছিলেন। একজন আয়া তাঁর বিশাল চুলের গোছা আঁচড়ে দিচ্ছিল। একদিনেই চেহারা ধ্বসে গেছে। রক্তাভ চোখ তুলে কৃপাসিন্ধুর দিকে তাকালেন। প্রথমটা বুঝতে পারেননি। পরিচয় দিতে ব্যাকুল চোখে তাকালেন। শরীরটা তিরতির করে কাঁপছিল।

"মাফ করবেন মা। আপনার কাছে এসেছি আপনাকে বিব্রত করতে নয়। আপনি কেমন আছেন, সেটা জানতেই এসেছি।"

"ভাল! ভাল... আছি!" আস্তে আস্তে নিজেকে স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করছিলেন জবালা। নিজের বেসামাল অবস্থাটা বাইরে প্রকাশ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ!

"আপনাদের কাজ... কতটা এগিয়েছে! রক্তাভ চোখদুটো যেন গ্রাস করছিল কৃপাসিন্ধুকে।

"কাজ চলছে। আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। একদিন যাব আপনার সঙ্গে গল্প করতে।"

"তুমি... বস!"

বসল কৃপাসিন্ধু। ভদ্রমহিলা এখনও অসাধারণ রূপসী। স্বামীর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না করতে ফের পুত্র শোক। মন ভেঙেছে। ফলে শরীরে তার ছাপ পড়েছে। তবুও মনে হয় বয়স যেন একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সৌন্দর্য আর ব্যক্তিত্ব জড়াজড়ি করে আছে বড়মণির মধ্যে। কৃপাসিন্ধুকে বিশ্বাস করছেন মনে হচ্ছে! নিবিষ্ট চোখে দেখছেন।

"তুমি কোথায় থাকো?

"সন্তোষপুরে।"

"কে কে আছেন তোমার?"

"মা আছেন।"

"কারও ক্ষতি কর না ! কারও ক্ষতি কর না!" হাহাকার করে উঠলেন জবালা।

"আপনার বাড়ি কোথায় মা?" কৃপাসিন্ধু আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশ্ন করে।

"আমি কটকের মেয়ে।"

"আচ্ছা ! এখানে বিয়ে হল কী ভাবে?"

"সে এক ইতিহাস! এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের বীজ সেদিনই বোনা হয়েছিল! না হলে এই ঘটনা ঘটতো কি? ঘটতো না! ঘটতো না!" বড়মণি মাথা ঝাঁকাতে থাকেন। খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ মনে হল কৃপাসিন্ধুর।

"আপনি কোন ঘটনার কথা বলছেন? আপনার বিবাহের সঙ্গে শুভব্রতর মৃত্যুর কি কোনও সংযোগ আছে?" কথা বলতে বলতে চেয়ারটা টেনে বড়মণির কাছাকাছি বসতে যাচ্ছিল কৃপাসিন্ধু। কিন্তু তার আগেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত বীভৎস চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালেন জবালা, "কীইই! কী বললি তুই? কী বললি?"

"কোন কথাটার কথা বলছেন?"

"তুই কার মৃত্যুর কথা বললি?" কৃপাসিন্ধুর গলা চেপে ধরেছেন জবালা, "কী বলেছিস তুই?"

"আপনার... ছেলে... শুভব্রত... ছাদ থেকে...পড়ে, মানে তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।"

"না, না! সে হয় না। তুমি ভুল করছ! মিথ্যে বলছ! শুভ পড়েনি! পড়েছে অন্য কেউ!"

কৃপাসিন্ধু পকেট থেকে কার্ণিশে পাওয়া চকচকে জিনিসটা বের করল, "এটা কার বলতে পারবেন?"

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সরকার বাড়ির

বড়মণি। কৃপাসিন্ধু ডাক্তারকে ডেকেছে। ডাক্তার বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ এরকম কেন হল! জেরা করছিলেন? মানসিক চাপ দেবেন না! উনি আঘাত পেয়েছেন। খুব ভেঙে পড়েছেন।"

"উনি কথা বলছিলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎই...!" কৃপাসিন্ধু উঠে দাঁড়িয়েছে।

জবালার জ্ঞানহীন শরীর পড়ে আছে বিছানায়!

২৭

যোগিনকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভোররাত থেকেই সে নেই!

কৃপাসিন্ধু খবরটা শুনে অবাকই হল। নেই মানে? গেল কোথায়? ও কি মাঝে মাঝেই নেই হয়ে যায় নাকি? যোগিন ছেলেটাকে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়েছে কৃপাসিন্ধুর। ওর কলকাতায় আসাটাই একটা রহস্যের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। কে যোগিন? সত্যি কিও নর্থবেঙ্গল এর ছেলে? ব্রজেন ও যোগিনের মধ্যে মূল সম্পর্কটা কী? অদ্ভুত তো! যাবে কোথায় যোগিন? বাড়িতে? নর্থবেঙ্গলে চলে গেছে কি? কেন যাবে কাউকে না জানিয়ে?

ব্রজেন বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে। চোখে ধূর্ততার পাশাপাশি এক ধরনের সতর্কতা দাঁড়িয়াবান্ধা খেলছিল। কৃপাসিন্ধু ব্রজেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। যোগিন নেই মানে কী? যোগিন কি পালিয়েছে? কৃপাসিন্ধু ব্রজেনের কথার সম্যক অর্থ বোঝার চেষ্টা করছিল।

ব্রজেন মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। যোগিন রাতে আমার পাশে বসে রাতের খাবার খেল। ও খেয়ে উঠে ঘুমোতে চলে গেল। আমার কিচেনে কাজ ছিল। পরের দিনের সবজি বেছে, কেটে ধুয়ে রাখা, মশলাপাতির কন্টেনার চেক করা। নাহলে রাঁধার সময় যদি দেখি হলুদ নেই তাহলে রান্না করার মনটা নষ্ট হয়ে যায়! তো, আমি ঘণ্টাখানেক পরে ঘরে গিয়ে দেখি যোগিন ঘরে নেই। আমি ভেবেছি ও রোজের মত ওই সময়ে বাথরুমে গেছে। একটু পরেই চলে আসবে। কারণ তখন বেশ রাত। বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে। একমাত্র বড়দাবাবুর ঘরে আলো জ্বলে অনেক রাত অবধি। উনি রাতে কাজ করেন। গান শোনেন। যোগিনকে ওঁর দরকার হয় না। হলেও যোগিন তো ওঘরে বসে থাকবে না!"

"ও ঠিক একই সময়ে ওয়াশরুমে যেত?"

"রোজ। আমি ঘরে ঢুকতাম, তখন ও আমার সাড়া পেয়ে উঠে বাথরুমে চলে যেত। এসে জল খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ত। কখনও আমার সঙ্গে দু চাট্টে কথা হত। কখনও হত না। আমার খুব ভোরে উঠতে হয়। তাই বিছানায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি আমি। কালও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরে উঠে দেখি যোগিন বিছানায় নেই। রাতের কথা ঘুম ভেঙেও মনে পড়েনি! পরে মনে পড়ল। যখন শুনতে পেলাম যে যোগিন নাকি পালিয়েছে।"

"কখন শুনলে খবরটা?"

"সকালে, নীলমদিদি পুজোর ফুলের জন্য তাগাদা করছিল। এদিকে যোগিন ফুল আনে ইদানিং। যোগিনের খোঁজ পড়ল। তখন জানা গেল যোগিন বাড়িতেই নেই! কখন পালিয়েছে, সে বলতে পারব না। কিন্তু রাতে খাওয়ার পরে আর ওকে দেখিনি। তাই মন বলছে ও বোধহয় রাতেই পালিয়ে গেছে।"

"ও পালাবে কেন?"

"আপনি জানেন না? বাড়ির সবাই জানে! ও পুলিশকে খুব ভয় পায় বলে আপনাদের বাড়িতে দেখার পর থেকেই বড্ড উচাটন হয়ে থাকত। আমার মনে হচ্ছে সেই জন্যই পালিয়েছে।"

"আশ্চর্য! আমাদের দেখেছে গত শনিবার। আজ মঙ্গলবার। পালাতে চাইলে আগেই পালাতে পারত! আজ কেন?"

"জানি না। কার মনে কী আছে!"

"সুরেন বর্মণের সঙ্গে তোমার কি যোগাযোগ আছে?"

"না, ও এদিকে আসে না।"

"না এলেও ফোনে যোগাযোগ থাকতেই পারে! তেমন যোগাযোগের কথা বলছি।"

"না না। আমার সঙ্গে সুরেন জামাইয়ের কোনও যোগাযোগ নেই বাবু। সে আমাকে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। এই পর্যন্ত কথা। এ বাড়িতে সে আসেনি কখনও।"

কৃপাসিন্ধু বাড়ির ভেতরের নিঝুম ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিল। হঠাৎই সব নির্জনতাকে কলা দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দুমদুম করে নেমে আসছে সুবর্ণা। পাশাপাশি নীলম। দুজনেই ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। কৃপাসিন্ধুকে দেখে সুবর্ণা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি এসেছেন! কে খবরটা দিয়েছে? ব্রজেন? ব্রজেন কী করে জানতে পারল? আপনাকে এত তাড়াতাড়ি কে দিয়েছে খবরটা?"

নীলমও উৎকণ্ঠায় কাঁপছিল। মুখ ফ্যাকাশে, "কে বলেছে?"

"কী হয়েছে খুলে বলুন। যোগিনকে পাওয়া যাচ্ছে না এই তো?"

"শুধু পাওয়া যাচ্ছে না এটাই নয়, যোগিন আমাদের বাড়ির যাবতীয় দলিল পত্র, গয়না নিয়ে পালিয়েছে!"

"মানে? সেটা কখন দেখলেন? মানে কখন জানতে পারলেন? এখন? এইমাত্র?"

"হ্যাঁ!" হাঁপাচ্ছিল সুবর্ণ, "কী কাণ্ড বলুন দেখি! আমি সকাল থেকেই শুনছি, দেখছিও যে যোগিন নেই। ও নাকি পালিয়েছে। আশ্চর্য হওয়ার মতই ঘটনা! অনেক বছর হল এ বাড়িতে এসেছে ও। কখনও ছুটি নেয়নি। আজ আমাদের কাউকে না জানিয়ে ও চলে গেল? খুব আশ্চর্যের ঘটনা নয় কি? আমার সকাল থেকেই মাথায় ঘুরছে ব্যাপারটা। কেন গেল যোগিন?"

"তারপর আপনি ভাবলেন কিছু চুরি গেছে কিনা খোঁজ নেওয়া যাক, এইতো?"

"একজ্যাক্টলি! আমি সেটাই ভেবেছি। আমার শাশুড়ি মা নার্সিং হোমে। ওঁর ঘরে কেউ নেই। ঘর বন্ধ থাকলেও সাফ করতে হয়। তখন খোলা হয়। তখন কিছু চুরি করেনি তো? ভেবে আমি মা'র ঘরে গিয়েছি। নীলম ছাদ থেকে নামছিল। আমি ব্যাপারটা বলাতে ও আমার সঙ্গে গেল। গিয়ে দেখি মায়ের আলমারি খোলা। ভেতরে গয়না, দলিল পত্র কিচ্ছু নেই! আলমারির গায়ে চাবি ঝুলছে বশংবদের মত!"

"আশ্চর্য!" কৃপাসিন্ধু যথার্থই অবাক হয়েছে।

"আপনি মা'র ঘরে আসুন একবার। দেখুন।"

"যাব নিশ্চয়। কিন্তু আমি ভাবছি যোগিন দলিল নিল কেন!"

"চালু ছেলে! হয়ত দেখবেন ব্ল্যাকমেল করছে। দলিল দেব, বিনিময়ে এত লাখ টাকা দাও! চেনেন তো এসব বাজে ছেলেদের! কেউটে পুষেছিলাম আমরা বাড়িতে? যথাসময়ে ছোবল মেরে দিল?" সুবর্ণার মুখ উত্তেজনায় লালচে।

ঘর সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে রাখা। বড়মণি শৌখিন মানুষ বোঝা যায়। চন্দন কাঠের ছোট ওয়াল রায়াকের ওপরে সাজিয়ে রাখা প্রসাধনী জিনিসপত্র। আয়ুর্বেদিক প্রসাধনী। এসব কোথা থেকে আসত? অনলাইনে?

"না তো!" সুবর্ণা ভেবে ভেবে বলতে থাকে, "অনলাইনে কিছু জিনিস আসত। এগুলো কিনা ঠিক করে বলতে পারব না।"

"উনি খুব শৌখিন।"

"হ্যাঁ। ছিলেন। কিন্তু বাবা মানে আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পর থেকে উনি অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন।"

"এটা কী?"

দেওয়ালের একধারে চমৎকার একটি বাক্স। লাল ভেলভেটে মোড়া। বেশ বড় বাক্স। হাতলে ছোট তালা।

"এটার চাবি কোথায়?"

"আমি জানি না। চাবি বড়মণির কাছেই থাকে সবসময়।"

"সব সময়?"

"হ্যা। এই বাক্সের চাবি বড়মণির কাছেই থাকে। আমি কখনও হাত দিইনি। উনি পছন্দ করতেন না।" নীলম খুব আস্তে কথা বলে। কৃপাসিন্ধু নীলমকে লক্ষ্য করছিল। এই মহিলাকেও জনার্দন নিয়ে এসেছেন এ বাড়িতে। এরা কারা? কেনই বা দল বেঁধে এসে ঢুকেছিল এখানে! তাদের একজন হল যোগিন। যে নিপাত্তা। পুরো ব্যাপারটাই খুব ঘোরালো! এই তিনটি মানুষকে এনে কী এমন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছিল জনার্দনের? দলিল নিয়ে যোগিন কি জনার্দনকে দিয়েছে? দিয়ে পালাবে কেন? এমন কেউ নেই যে দলিল চুরির জন্য যোগিনকে সন্দেহ করতে পারে! তাহলে যোগিনের ভয়টা কাকে? নাকি আদৌ যোগিন পালায়নি!

বিরাট আয়নার সামনের ড্রয়ার টেনে দেখল কৃপাসিন্ধু। প্রতিটি ড্রয়ারের মধ্যে ছোট বড় কৌটো। জেলি ধরনের লালচে থকথকে পদার্থ ভেতরে। এগুলো কী? কৌটোর গায়ে কিছু লেখা নেই। এসব কি খাওয়ার নাকি মাখার বুঝতে পারছে না কৃপাসিন্ধু। একেবারে নীচের ড্রয়ারে রয়েছে একটি বই। হাতে লেখা বই! বেশির ভাগ অক্ষর ঝাপসা হয়ে গেছে। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, সেটুকুও অবোধ্য। কিসের ওপরে লেখা এই বই? নীলম এ ঘরে বেশির ভাগ সময় কাটায়। ও জানতে পারে!

"না, আমি জানি না এটা কিসের বই। তবে বড়মণিকে এই বই নিয়ে স্নানঘরে ঢুকতে দেখেছি যদিও উনি আমাকে লুকিয়ে এটা নিয়ে স্নানের ঘরে যেতেন! জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি। হয়ত স্নানের পরে স্তোত্র পাঠ করেন। মন্ত্র লেখা আছে! কিন্তু লুকিয়ে নিতেন কেন, বলতে পারব না! আমি বড়মণি সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না।" নীলম আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াতে থাকে।

বইটা কৃপাসিন্ধু নিয়ে নিজের কাছে রাখল। সুবর্ণাকে দেখিয়ে রাখল, "বইটি আমি একদিনের জন্য রাখছি। কাল এসময় ফেরত দেব।"

"বেশ। রাখুন। কিন্তু, আলমারি থেকে দলিল চুরির ব্যাপারটা দেখুন।"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট আসবে। আলমারির গায়ে নিশ্চয় ছাপ পাওয়া যাবে।"

২৮

ঘরের ভেতরে হিংস্র শব্দ। কেউ কাউকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেললে যেমনটি হয়। যেন বাঘের নখের আওয়াজ আসছে। কী হচ্ছে বড়মণির ঘরে? ত্রাসে নীলম প্রায় দৌড়ে গিয়ে সুবর্ণা আর দেবব্রতকে ডেকে নিয়ে এসেছে। তিনজনেই পড়িমরি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার বাইরে। ভেতরে আর্তনাদের পাশাপাশি জান্তব চিৎকার গোঁ গোঁ করছিল। কেউ যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে! কী হচ্ছে ঘরের ভেতরে?

"দরজা ভেঙে ফেলতে হবে। দেরি করা যাবে না। মা ভেতরে আছে। তাড়াতাড়ি করে ডাকো সবাইকে।" বলে দেবব্রত নিজেই চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে লাগল, "ব্রজেন...ব্রজেন...পদ্ম...!"

মুহূর্তের মধ্যে দরজার সামনে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। দেবব্রত আর ব্রজেন মিলে দরজায় জোর ধাক্কা দিয়ে চলেছে। কিন্তু ভারি কাঠের দরজা সামান্যতম নড়ছে না। দেবরত দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। উপায় পাচ্ছিল না খুঁজে। ফোন বের করে কৃপাসিন্ধুকে ফোন করে বসল। উপায় নেই ওর। বন্ধ ঘরের ভেতরে মা রয়েছেন। এবং অস্বাভাবিক আওয়াজ আসছে! দরজা খুলছেন না। কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না! দরজা ভেঙে ফেলার মত কেউ নেই। দেবব্রত আর ব্রজেন পারছে না শক্তি সম্মিলিত করেও। থানা থেকে যদি একটা সাহায্য পাওয়া যায়...!

থানা বেশি দূরে নয় বলেই হয়তো মিনিট সাতেকের মধ্যে গাড়ি চলে এল। পুলিশ ভ্যান। কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে চারজন কন্সটেবল। দরজার বাইরের জমায়েতের দম বন্ধ করা চেহারা দেখে পরিস্থিতি বুঝে নিল কৃপাসিন্ধু। ভেতরে হিস হিস আওওয়াজ হচ্ছে! তীব্র রাগে কেউ শ্বাস ফেলছে যেন। আর দেরি না করে কৃপাসিন্ধু ডিশিসন নিয়ে নিল। সবাইকে সরে দাঁড়াতে বলে নিজে সাইডে দাঁড়াল। ইশারা করা মাত্র কন্সটেবল চারজন দরজা ভেঙে ফেলতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজা ভেঙে ফেলার পরে ঘরের ভেতরে তাকিয়ে কৃপাসিন্ধু অবাক হয়ে গেল। এক বৃদ্ধা ঘরের কোণে জড়োসড়ো, বড়মণি তার গলা টিপে ধরে আছেন! বৃদ্ধার চোখ উলটে গেছে। জিভ বেরিয়ে এসেছে। ছুটে গিয়ে বড়মণিকে বৃদ্ধার শরীরের ওপর থেকে সরালো সকলে মিলে। অসীম শক্তি বড়মণির মধ্যে। হিমসিম খেয়ে গেল সকলে।

বৃদ্ধার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে তাকে কিছুটা সুস্থ করা হল। কথা আটকে যাচ্ছে। কিছু বলতে চাচ্ছিল বৃদ্ধা। জিভ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেন। কৃপাসিন্ধু কন্সটেবলদের ইশারা করল বৃদ্ধাকে বাইরের বাতাসে মধ্যে নিয়ে যাওয়ার। নিজেও সঙ্গে গেল। কে এই বৃদ্ধা? এর কথাই কি যোগিন বলেছিল সেদিন? একেই কি বড়মণির ঘরে ঢুকতে দেখেছিল যোগিন? ঢুকে কোথায় লুকিয়েছিল? তন্নতন্ন করেই তো বড়মণির ঘরটা খোঁজা হল! কিন্তু বড়মণি ছাড়া দ্বিতীয় কারও উপস্থিতি টের পাওয়া যায়নি! বড়মণির ঘরে কি লুকিয়ে থাকার মত গুপ্ত জায়গা আছে? বৃদ্ধাকে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল? কে লুকিয়ে রেখেছিল? বড়মণি? আশ্চর্য!

বৃদ্ধা জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে, কৃপাসিন্ধু আটকাল, "আপনি কে? বড়মণির ঘরে ঢুকেছিলেন কেন?"

বৃদ্ধা মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়েই আছে। জবাব দেয় না। কৃপাসিন্ধু বুঝতে পারছিল মহিলা ঘোড়েল বস্তু বিশেষ। সহজে মুখ খুলবে না। অথচ এর কাছে রহস্যের চাবির খানিকটা হলেও আছে।

দরজায় ক্রমান্বয়ে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে চলেছিল ওরা তিনজন। কিন্তু ভেতরে তার জন্য কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না। এই বৃদ্ধা কেন এসেছিল বড়মণির ঘরে? এটা একটি প্রশ্ন। অন্য প্রশ্ন হল, বড়মণির ঘরে ঢুকেছিল মানে হঠাৎ করে ঢোকেনি! যাতায়াত ছিলই মনে হচ্ছে কৃপাসিন্ধুর। কিন্তু সেদিন বৃদ্ধাকে ধরিয়ে দেননি বড়মণি। চোখ লাল করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন। আজ কেন বৃদ্ধাকে আক্রমণ করেছিলেন? কেন এমন রেগে গেলেন? কী হয়েছিল?

বৃদ্ধা কোনওভাবেই সহযোগিতা করল না। কৃপাসিন্ধু বৃদ্ধাকে বাড়ির ভেতরের একটি ঘরে

কৃপাসিন্ধু নীলমকে লক্ষ্য করছিল। এই মহিলাকেও জনার্দন নিয়ে এসেছেন এ বাড়িতে। এরা কারা? কেনই বা দল বেঁধে এসে ঢুকেছিল এখানে! তাদের একজন হল যোগিন। যে নিপাত্তা। পুরো ব্যাপারটাই খুব ঘোরালো! এই তিনটি মানুষকে এনে কী এমন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছিল জনার্দনের? দলিল নিয়ে যোগিন কি জনার্দনকে দিয়েছে? দিয়ে পালাবে কেন? এমন কেউ নেই যে দলিল চুরির জন্য যোগিনকে সন্দেহ করতে পারে! তাহলে যোগিনের ভয়টা কাকে? নাকি আদৌ যোগিন পালায়নি!

আটকে রাখার আদেশ দিল। বৃদ্ধাকে খুব দরকার। এই মহিলা এমন কিছু জানে, যা এই কেসের ব্যাপারে সহায়ক হবে। একে যেতে দেওয়া চলবে না।

বৃদ্ধাকে পশ্চিমের ঘরে রাখা হল। ছোট ঘর। বাইরে একফালি বারান্দা। সেই বারান্দায় একজন কন্স্টেবল পাহারায় আছে। কৃপাসিন্ধু কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছে, কেউ যেন এই ঘরে ঢুকতে না পারে! বৃদ্ধার সঙ্গে কাউকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হল না। কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছে কৃপাসিন্ধু।

সেদিনের মত কাজ কিছু আর এগোলো না। রাত ঘন হয়েছে। দেবব্রত ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ছিল। নীলম ফোন করে মানসরঞ্জনকে বাড়িতে ডেকেছিল আজ। উনি আসার পরে বড়মণি আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছিলেন। নীলম দুজনকে রেখে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। কী কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে, সে ও জানে না। জানার প্রয়োজন অনুভব করেনি। নিজের ঘরের জানালা খুলে দাঁড়াল নীলম। আজ ঠান্ডা একটু কম মনে হচ্ছে। পশ্চিমের ঘরের দিকে একবার তাকাল নীলম। জানালা বন্ধ করে দিল। কনকনে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। আজ বৃদ্ধার ঘরে দুধ দিয়ে আসতে হবে। বুড়িটা কথা বলে না। অথচ নীলম ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়। এই বুড়ি এমন কী জানে যা আর কেউ জানে না! বড়মণির সঙ্গে বুড়ির সম্পর্কটা কী? খানিকটা জানে। আজ সিওর হতে হবে। নীলম জানালা বন্ধ করে দিল।

সুবর্ণা এসে পাশে দাঁড়াতে দেবব্রত তাকাল। কিছু বলবে সুবর্ণা।

"কী হল? শুতে যাওনি? রাত হয়েছে। ঠান্ডাও পড়েছে বেশ।"

সুবর্ণা কথা বলার আগে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। লম্বা বারান্দাটা চলে গেছে ছাদের সিঁড়ির দিকে। ঘুটঘুটে নির্জন ছাদে অন্ধকার একা একা খেলা করে। ওদিকে তাকিয়ে বুক ভয়ে শিরশির করে উঠল সুবর্ণার।

"কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ। কঙ্কা কাল চলে যাচ্ছে।"

"হঠাৎ?"

"চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা। তাহলে যেতেই হবে। থানায় জানিয়ে যাওয়াই ভাল। কাল ওকে নিয়ে যাব তাহলে থানায়।"

"কী সব হয়ে গেল বাড়িতে!" সুবর্ণা শ্বাস ফেলে, "বুড়িটা কে?"

"আমি অনেকদিন আগে মায়ের ঘরে দেখেছিলাম বুড়িটাকে। মা বলেছিল, মায়ের চুলে তেল দিয়ে আঁচড়ে দেয়... চুল বেঁধে দেয় ইত্যাদি। ভুলেই গিয়েছিলাম। আশ্চর্য। বুড়িটাকে প্রথম দেখি আমার বারো-তেরো বছর বয়সে। এখনও একই রকম আছে। যতটুকু বয়স বেড়েছে, ততটুকুতেই আটকে আছে। সত্যি! এটা বিশ্বাস করার বিষয় নয়।"

"ঠান্ডায় থেক না। চল, শুয়ে পড়ি। থানা পুলিশ বাড়ির মধ্যে ঢুকলে বাড়িটা বাড়ি থাকে না। হাট হয়ে যায়!" সুবর্ণার গলায় আফশোসের পাশাপাশি ক্ষোভ ছিল।

ওরা চলে গেল ঘরে। বাইরে ঠান্ডা জমতে শুরু করেছে। অন্ধকার জমাট হয়ে উঠছে। কেউ হেঁটে হেঁটে চলে গেল ছাদের সিঁড়ির দিকে। তার পা মাটিতে পড়ছে না। হাওয়ায় ভেসে ভেসে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে সমস্ত বাড়ি ভয়ে ত্রাসে নিশচুপ হয়ে গেল। বারান্দায় কন্সটেবল ছিল না। সে ঠান্ডায় বৃদ্ধা যে ঘরে আছে, সে ঘরের দরজায় তালা মেরে পাশের ঘরে শুয়েছিল। বৃদ্ধা পশ্চিমের ঘরে একাই ছিল। সকালে দরজা খুলে চমকে উঠেছে কনস্টেবল। বুড়ি ঘরের ভেতরে মরে পড়ে আছে। শরীর শক্ত। অন্তত সাত থেকে আটঘন্টা আগে মারা গেছে বৃদ্ধা। একটা শূন্য কাপ টেবিলের ওপর রয়েছে। তলানিতে সামান্য দুধ রয়ে গেছে। বৃদ্ধা রাতে দুধ খেয়েছিল?

কৃপাসিন্ধু এসেছে খবর পেয়েই। কাপে দুধের অবশিষ্টাংশ দেখছিল। কন্সটেবলের হাতে রুমাল দিয়ে মুড়িয়ে কাপটা দিল— এই দুধটুকু পরীক্ষা করতে হবে। কাপে ফিঙ্গার প্রিন্টও। দুধ দিয়েছিল কে?

"আমি।" নীলম এগিয়ে আসে। ক্রিম কালারের শাড়ি, সঙ্গে প্রিন্টেড থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজ। প্রসাধনহীন মুখে ক্লান্তি আটকে রয়েছে।

"আপনি দুধ খাইয়ে এসেছিলেন বৃদ্ধাকে?"

"না। উনি বললেন পরে খাবেন। আমি টেবিলের ওপর রেখে চলে আসি।"

"সেটা কখন?"

"রাত ন'টা হবে। ঠিক মনে নেই। রাত গভীর হয়নি তখনও। আমি শুতে যাওয়ার আগে গিয়ে বৃদ্ধাকে দুধ দিয়ে আসি, কারণ উনি রাতে দুধ ছাড়া কিছু খান না।"

"কন্সটেবল আপনাকে দেখেছিল?"

"হ্যাঁ। সে-ই দরজা খুলে দিয়েছিল। আমি বেরিয়ে আসতে সে ফের তালা লাগিয়ে দিয়েছিল।"

কৃপাসিন্ধু দু'চারটে কথার পরে বেরিয়ে এল। দুধে বিষ ছিল মনে হচ্ছে। বৃদ্ধা আত্মহত্যা করল কি? নীলমের সঙ্গে একটু সময় কথা বলল কৃপাসিন্ধু। নীলম বড়মণিকে কাছ থেকে দেখেছে। ও অনেক কথা জানে। বড়মণির সখের কথা। পছন্দের কথা।

তেমন সখ বলতে নীলম কিছু মনে করতে পারল না। কেবল মাঝে মাঝে বারান্দার মাংসাশী গাছগুলোকে পোকা খাওয়াতেন। এছাড়া... আর কিছু...!

২৯

বাড়ির প্রত্যেক সদস্য উপস্থিত ছিল। ঘরে অদ্ভুত নৈশঃব্দ! যাকে বলে পিনড্রপ সাইলেন্স! কৃপাসিন্ধু আজ বিকেলে পরিবারের সবাইকে হাজির থাকতে বলেছিল। কিছু ঢাকাচাপা ঘটনা খুলে দেখার সময় এসেছে। দত্ত এবং বিমান ছিলেন। কেস কমপ্লিট।

"আজ আপনাদের কাছে শুভব্রত সরকারের মৃত্যুরহস্যের পর্দা তুলতে যাচ্ছি। এই সরকারবাড়ি আরও পাঁচটা বনেদি বাড়ির মতই রহস্যে ভরপুর। একটি মৃত্যুর রহস্যের ভেতরে আরেকটি মৃত্যুর রহস্যের চাবি লুকিয়ে আছে। সেই চাবি খুঁজে পেয়েছি, এটাই আমাদের সাফল্য।

এই বাড়িতে দু'জন মানুষ অপঘাতে মারা গেছেন। সত্যি কি দুর্ঘটনা? শুভব্রতর কথা আমরা জেনেছি, শুভব্রতকে খুন করা হয়েছে। আরেকজন? সুখময় সরকার? হ্যাঁ, চমকে যাবেন না। প্রথমে যিনি মারা যান ছাদ থেকে পড়ে, তিনি এ বাড়ির মালিক বলুন, কর্তা বলুন, সুখময় সরকার। তাঁকেও খুন করা হয়েছে। আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা বলে চালাতে চেষ্টা করা হলেও আদতেই তাঁকেও খুনই করা হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে খুন। ইটস আ মার্ডার কেস।

এবারে দেখতে পাচ্ছি, এই বাড়িতে যত্রতত্র ভূত দেখা যায়। কেউ কেউ দেখে। সবাই নয়। প্রথমে আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। প্রত্যেকের জবানবন্দী নেওয়ার পরেও সে জট ছাড়াতে পারছিলাম না। এখানে একটা নতুন রহস্য এল। জনার্দন রহস্য। তিনি তিনটে মানুষকে এই বাড়িতে ঢুকিয়ে দিলেন। নীলম। হরিদ্বারে বড়মণির সঙ্গে দেখা হল নীলমের। অনাথ তরুণী। জনার্দনের পরামর্শে নীলম বড়মণির সঙ্গে এ বাড়িতেএল। এভাবে এল ব্রজেন। এল যোগিন। প্রশ্ন হল, এরা কেন এল? জনার্দনের কী উদ্দেশ্য? এক নম্বর প্রশ্ন।

দু' নম্বর হল, যোগিনের অন্তর্ধান। সঙ্গে চলে গেল কিছু অলঙ্কার, বাড়ির দলিল। অলঙ্কার না হয় বোঝা গেল। কিন্তু যোগিন দলিল নিয়ে কী করবে?

তিন নম্বর প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি। বৃদ্ধা কে? বড়মণির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

এই তিনটি প্রশ্ন আসলে মূল গল্পের শাখা প্রশাখা। তাহলে মূল গল্পটি কী?

এ বাড়ির লোক ভূত দেখে। কোথায়? যেখানে দুটো বডি ছাদ থেকে পড়েছিল, তার আশেপাশে তারা ভূত দেখে। মাত্র একবারই দেখা গেলে বোঝা যেত চোখের ভুল। কিন্তু একাধিক লোক একাধিকবার ভূত দেখে ফেলছে এমন কেউ আছে যে খুনি হতে পারে, আবার না-ও পারে। তবে এই খুনের জন্য তার আলাদা আকর্ষণ আছে বলে সে বারবার অকুস্থগুলো ঘুরে দেখতে আসে। কিন্তু লুকিয়ে আসে। ফলে সে ভূত হয়ে দেখা দেয় কারও কারও চোখে। প্রশ্ন হল, সে কে?

যোগিনকে দিয়ে শুরু করি। যোগিন বলেছিল ওকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিল পাড়ার লোক সুরেন বর্মন। আবার ব্রজেন জানাল ওকে নিয়ে এসেছিল জামাই সুরেন বর্মন। অথচ সুরেন বর্মন নামে আমরা যাকে খুঁজে পেয়েছি, সে অন্য লোক। সে যোগিন বা ব্রজেনকে চেনে না। জীবনে দেখেনি। এমনই সাদাসিদে মানুষ, যে একা কলকাতায় আসার কথা ভাবতে পারে না। তাহলে যোগিন বা ব্রজেন ওকে চিনল কী করে? ওর চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছিল ব্রজেন বা যোগিন, সেই বর্ণনার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই সুরেন বর্মনের। তাহলে সুরেন বর্মন কে আসলে?

ভেতরে হিস হিস আওওয়াজ হচ্ছে! তীব্র রাগে কেউ শ্বাস ফেলছে যেন। আর দেরি না করে কৃপাসিন্ধু ডিশিসন নিয়ে নিল। সবাইকে সরে দাঁড়াতে বলে নিজে সাইডে দাঁড়াল। ইশারা করা মাত্র কন্সটেবল চারজন দরজা ভেঙে ফেলতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজা ভেঙে ফেলার পরে ঘরের ভেতরে তাকিয়ে কৃপাসিন্ধু অবাক হয়ে গেল। এক বৃদ্ধা ঘরের কোণে জড়োসড়ো, বড়মণি তার গলা টিপে ধরে আছেন! বৃদ্ধার চোখ উলটে গেছে। জিভ বেরিয়ে এসেছে। ছুটে গিয়ে বড়মণিকে বৃদ্ধার শরীরের ওপর থেকে সরালো সকলে মিলে।

আসলে কেউ নয়। ওটা কাকতালীয়ভাবে মিলে গিয়েছিল বলা যাবে না। কারণ যোগিন অনেকদিন আগে উত্তরবঙ্গে থেকেছে। তখনই এই নাম ওর কানে এসেছিল। এখন যখন ও কোথা থেকে এখানে এসেছে এই প্রশ্ন এল, যোগিন ঝট করে সুরেন বর্মনের কথাই বলে ফেলেছে। আবার ব্রজেন যোগিনের থেকে সুরেনের নাম শুনে নিজেও একই নাম ইউজ করে ফেলেছে। তাই তো ব্রজেন? সুরেন বর্মন নামে সত্যি তোমার চেনা কেউ আছে?"

"ভুল হয়ে গেছে স্যার।" ব্রজেন মাথা নীচু করে থাকে।

"ভুল হয়েছে অনেকবার। অনেকের। এবারে গল্পের মূল পর্বে ঢুকছি। এই গল্প শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগে। একই বংশের বলা উচিত শরিকের তরফ থেকে স্বতন্ত্রভাবে দুটো সম্বন্ধ যায় একটি পাত্রীর উদ্দেশে। পাত্রপক্ষের কেউই পরস্পরের কথা জানতো না। পাত্রী অতীব সুন্দরী। পাত্রপক্ষের দেখামাত্রই পছন্দ। কিন্তু বাদ সাধল পাত্রীপক্ষ। তাঁরা দু'জন পাত্রের থেকে একজনকে বেছে নিলেন। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সেই ব্যর্থ পাত্রের বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সেই শুরু হল। পরিবারের খুব কাছের লোক হয়ে উঠল সেই পাত্র। আগে শরিকি ঝামেলা, মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পরম বন্ধু হয়ে উঠল। এবং ইত্যবসরে জিতে যাওয়া পাত্রটিকে মদ্যপানে অভ্যস্ত করে তুলল। এটাই হল সুখময়বাবুর এবং তাঁর স্ত্রীর জীবনের অশুভ শক্তির আক্রমণ। জবালাদেবী ব্যর্থ পাত্রটিকে মনে করলেন ব্যর্থ প্রেমিক। যদিও কখনই তিনি প্রেমিককে মন দেননি। কিন্তু চিনেছিলেন। আদপেই সেই ভদ্রলোক জবালাদেবীর বা বড়মণির প্রেমিক ছিলেন না। ছিলেন একজন হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ। সেই জন্য চেষ্টা করলেন সুখময়ের সংসারকে ছারখার করে দিতে। ছোট ছেলেকে হাত করে সংসারে নানাভাবে অশান্তি চালিয়ে যেতে থাকলেন। জনার্দনকে দিয়ে দু'জন সরি তিনজন মানুষকে এই বাড়িতে ঢোকালেন। যারা তাঁর হয়ে কাজ করবে। যোগিন যেমন করেছে। যোগিন চুরি করতে পারে। কিন্তু দলিল চুরি করল কার হুকুমে? কে চায় এদের ক্ষতি করতে? দলিল দিয়ে যোগিনের কাজটাই বা কী? কিচ্ছু না! তাহলে কে করিয়েছে এই কাজ যোগিনকে দিয়ে? আঙুল একটি লোকের দিকে যাচ্ছে। তিনি মানসরঞ্জন। শুভব্রতকে দিয়ে সম্পত্তি গ্রাস করানোর বুদ্ধিও এই ভদ্রলোকের। এদিকে জবালাদেবীর খাস দেখাশোনা করেন নীলম। তিনি ঘরের সব খবর মানসকে পৌঁছে দেন। কিন্তু সকলের অজ্ঞাতসারে বড়মণিকে ভালবেসে ফেলে নীলম। সেই সঙ্গে ভালবাসেন বড়মণির ছোট ছেলেটিকে। সে-ও বুঝতে পেরেছিল। ছাদে দেখা হত দু'জনের। এই ব্যাপারে পদ্মর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নীলম আমাকে জানিয়েছেন, একা ঘরে মানসরঞ্জনের প্রেমিকের ভূমিকা। কিন্তু ধীরে ধীরে মানস বুঝতে পেরেছেন বড়মণি কখনই তাঁর হবেন না। তীব্র হতাশা, তীব্র ক্ষোভ মানসকে উন্মাদ করে তুলল। জবালা বুঝতে পারছেন। কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। হাজার হোক, আত্মীয়। কিন্তু একদিন হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল মানসরঞ্জনের আসল পরিচয়টা স্বামীকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু তার আগেই মানসরঞ্জন অন্য চাল চেলেছেন। রাতের অন্ধকারে মদ্যপানের আসর বসালেন ছাদে। একে অন্ধকার, তাতে ন্যাড়া ছাদ। আকণ্ঠ নেশায় ডুবিয়ে রাখলেন সুখময়কে। তারপর ছাদের কিনারায় নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিলেন। অথবা এমনও হতে পারে— এই যে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই, চল। বলে সুখময়কে পা বাড়াতে সাহায্য করলেন! সুখময় শূন্যে পা বাড়ালেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে সুখময় একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, মদ্দা। ব্রজেন শুনে ভেবেছিল সুখময় মদ শব্দটি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু বড়মণি জানতেন সুখময় এবং মানসের মধ্যে মজার ডাক ছিল। সুখময় মানসকে আড়ালে মদ্দা বলে ডাকতেন। মানসদার অতি সংক্ষেপিত রূপ। বড়মণি সন্দেহ করতে শুরু করলেন মানসকে। উনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামীর হত্যাকারী কে! সারাক্ষণ একই ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। প্রতিশোধ। এদিকে মানস সুখময়ের সংসারের ছাল চামড়া খুলে ডুগডুগি বাজানোর চেষ্টায় মেতে উঠলেন। শুভব্রতকে সম্পত্তির ভাগের জন্য তাঁতালেন। বড়মণি চিনে ফেলেছিলেন অশান্তির হোতাটিকে।

তিনি বুঝলেন, যে আর দেরি করা ঠিক হবে না। সম্ভবত সেদিন অভিনয় করে মানসরঞ্জনকে ছাদে দেখা করতে বললেন। রাতের দিকে। নিজে সে সময় স্নানে গেলেন। কিন্তু বাথরুমের পেছনের দরজা দিয়ে ছাদে গেলেন সকলের অগোচরে। দেখলেন অন্ধকারে মানসরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছেন। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে জোরে ধাক্কা দিলেন।

আচমকা ধাক্কা খেয়ে হতভাগ্য শুভব্রত হাত বাড়িয়ে কিছু ধরে ফেলতে চাইলেন। ধরে ফেললেন মায়ের গলার হার। হাতের টানে হার ছিঁড়ে গেল। লকেটটা পড়ে রইল কার্ণিশে।

বড়মণি জানতেন না মানসরঞ্জন তখনও আসেননি। নীলমের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে শুভব্রত এসে ছাদে অপেক্ষা করছিল।

একটি মানুষকে খুন করে বড়মণি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই মানুষ তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে, তবুও। তিনি তো সত্যি করে খুনী নন। কিন্তু স্বামীকে খুন করেছে যে, তাকে ছেড়ে দিতে পারলেন না বড়মণি। অসুস্থ হয়েছেন বলে তাঁকে নার্সিং হোমে রাখা হল। মানসিকভাবে আহত হবেন বলে কেউ তাঁকে পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দেয়নি। কিন্তু তিনি অসুস্থ হওয়ার পরে লোকে জানল তিনি শুভব্রতের মৃত্যুতে আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়েছেন।

আমিও সেটাই জানতাম। যখন আমার মুখ থেকে শুভব্রতর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন, তখন অতর্কিতে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল— ছাদে শুভব্রতকে কেন? মানসরঞ্জনকে তো!

এরপরের ছবি পরিষ্কার। মানসরঞ্জনকে জেরা করে জট ছাড়ান হল। নীলম এবং শুভব্রতর সম্পর্কটা নীলমের জবানবন্দী নেওয়ার সময় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। "ওঁর মত মানুষ অপ্রয়োজনে কথা বলে না।" এটা শ্রদ্ধা, ভালবাসা ফুটে উঠেছিল কথার মাধ্যমে। একটা বিপজ্জনক লোকের প্রতি এই ভালবাসা কি অযথাই?

এবারে বৃদ্ধা। এই বৃদ্ধা যাদুবিদ্যা নিয়ে কাজ করে। বড়মণি এঁকে চিনতেন কুমারী অবস্থা থেকে। নানা রকম ওষুধ, তন্ত্র শিক্ষা দিয়ে বড়মণির কাছে বৃদ্ধা অপরিহার্য হইয়ে পড়েছিল। যৌবন ধরে রাখার বিদ্যা শিখেছিলেন বড়মণি। এর জন্য কিছু ওষুধপত্র বৃদ্ধা আমদানি করতো। বাথরুমের পেছনের দরজা ছাড়াও আরেকটি গুপ্ত দরজা বৃদ্ধার জন্য ইউজ করা হত। দরকারে সেখান দিয়ে পালিয়ে যেত বৃদ্ধা।

এখন প্রশ্ন, বৃদ্ধা কি আত্মহত্যা করেছে? দুধের কাপে নীলমের আঙুলের ছাপ পাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু বৃদ্ধাকে মরতে হল কেন? আমি মনে করি নীলম বিষয়টা বলতে পারবেন। সেদিন রাতে আপনি বৃদ্ধার সঙ্গে বড়মণির কথা শুনেছিলেন। তাই তো? বৃদ্ধা গুপ্ত পথে ঘরে ঢুকে বড়মণিকে ঘরে না পেয়ে বাথরুমের দরজা দিয়ে ছাদে যায় এই ভেবে যে বড়মণি ছাদে আছেন। সেই সময় বড়মণিকে খুন করতে দেখে ফেলে। সে কথা বড়মণিকে জানিয়ে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। বড়মণি সহ্য করতে পারেননি। তিনি গলা টিপে ধরেছিলেন বৃদ্ধার। পুরো ঘটনাটা জানতে পারে নীলম। সে বড়মণির কষ্ট আর নিতে পারছিল না। বৃদ্ধার হাতে মারাত্মক অস্ত্র আছে বড়মণির বিরুদ্ধে। নীলম দুধ খাইয়ে এল বৃদ্ধাকে। বিষ মিশিয়ে দিয়ে।

"আমি কথা শুনেছিলাম। সত্যি। কিন্তু কাউকে বলতে পারিনি।" নীলম স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

"বেশ। ধন্যবাদ সহযোগিতার জন্য। আমরা যোগিনকে পেয়েছি এক বস্তিতে। দলিল সে নিয়ে মানসরঞ্জনকে দিয়েছে। জনার্দন মানসের লোক। বাড়ির ভেতরে অশান্তির বীজ পুঁতে দেওয়ার জন্য সে নিজের লোক লাগিয়ে দিয়েছিল মানসের হুকুমে। তাঁর পয়সা খেয়ে। শুভব্রতকে মদ, মাদক খাওয়ানোর ভার ছিল ব্রজেনের ওপরে। যোগিন বাইরে থেকে, মানসের থেকে বলাই ভাল, মাল নিয়ে আসতো।"

দেবব্রত কাঁদছিল অঝোরে। ক্ষোভে, দুঃখে, ভালবাসায় কাঁদছিল। নীলম স্থির হয়ে আছে। কোনওকথার প্রতিবাদ করেনি। ব্রজেনও তাই। যোগিনকে আগেই হাজতে নেওয়া হয়েছে চুরির দায়ে।

"আমি কি একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি অফিসার?" দেবব্রতর গলা কাঁপছে।

"নিশ্চয় পারেন। ওঁর মত মহিলা আমি দেখিনি। যান। কিন্তু উনি অসুস্থ। ডিস্টার্ব করবেন না।"

"অফিসার!"

চমকে তাকাল কৃপাসিন্ধু। নীলম উঠে

পাত্রী অতীব সুন্দরী। পাত্রপক্ষের দেখামাত্রই পছন্দ। কিন্তু বাদ সাধল পাত্রীপক্ষ। তাঁরা দু'জন পাত্রের থেকে একজনকে বেছে নিলেন। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সেই ব্যর্থ পাত্রের বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সেই শুরু হল। পরিবারের খুব কাছের লোক হয়ে উঠল সেই পাত্র। আগে শরিকি ঝামেলা, মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পরম বন্ধু হয়ে উঠল। এবং ইত্যবসরে জিতে যাওয়া পাত্রটিকে মদ্যপানে অভ্যস্ত করে তুলল। এটাই হল সুখময়বাবুর এবং তাঁর স্ত্রীর জীবনের অশুভ শক্তির আক্রমণ।

দাঁড়িয়েছে। সোজাসুজি তাকিয়ে আছে, "আপনি সবই জানেন। কিন্তু একটি কথা আপনার জানা নেই! মানুষের শরীরের চর্বি গলিয়ে সেই তেল দিয়ে যৌবন অটুট রাখার পদ্ধতি জানতো বৃদ্ধা। সেই তেল বড়মণি ইউজ করতেন। তাঁর মধ্যে অসম্ভব হিংস্রতা ছিল। আপনি জানেন না, একটা সময় এই বাড়ি থেকে একজন হারিয়ে যায়। ললিতা। তার শোকে আত্মহারা স্বামীকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার নাম করে যমের দুয়ারে পাঠানো হয়। অর্থাৎ হাজব্যান্ড-ওয়াইফ দু'জনেই হারিয়ে গেল। কোথায় গেল? সেই রাতে বুড়িকে চেপে ধরাতে সে স্বীকার করেছিল, সেই দু'জনকে মেরে শরীর থেকে চর্বি বের করে, সেই তেল বোতলে পুরে স্নানের আগে শরীরে ম্যাসাজ করেছেন বড়মণি। এমনটা আগেও করেছেন। কিন্তু আমি কেন বুড়িকে বিষ দিয়েছি বলুন? সেই হারিয়ে যাওয়া ললিতা, হরিরাম আমার বাবা-মা! ওরা এই বাড়িতে কাজ করে আমি জানতাম। তারপর যখন হারিয়ে গেল ওরা, আমাকে কেউ জানায়নি। আমি এই বাড়িতে কাজ নিয়েছি, শুধু ওদের খবর জানার জন্য। পদ্ম অনেক খবর দিয়েছে আমাকে। না বুঝেই দিয়েছে। আমি খুঁজেছি রহস্যের শেষ। বুড়ি গতরাতে আমাকে সবটুকু জানিয়েছে। তারপর ওকে বিষ খেতে বাধ্য করলাম। আর বড়মণিকে কী শাস্তি দেব? উনি নিজের শাস্তি নিজেই নিয়ে বসে আছেন।"

কৃপাসিন্ধুর বিহ্বল চোখের সামনে থেকে নীলমকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছিল।

৩০

"তাহলে স্যার, একটা খুনি ধরতে গিয়ে আরও দুটো খুনি ধরে ফেললেন?"

"তাই তো দেখছি। কিন্তু জবালাদেবীকে অপরাধীর তালিকায় রেখ না। আপনজনদের ভালবেসে এতখানি ক'জন করতে পারে?"

"কিন্তু আপনি বড়মণিকে সন্দেহ কখন করলেন?"

"নীলমের কথা থেকে। মানসরঞ্জন বড়মণিকে আদর করে নানা নামে ডাকতেন। সেটা কেন? এখান থেকেই সন্দেহের সূত্রপাত। তাছাড়া একজন অদৃশ্য মানুষ সবসময় থাকে। যাকে ঝট করে বোঝা যায় না। সন্দেহের মধ্যে আনাই হয় না। কিন্তু চাবিকাঠি তার কাছেই থাকে। প্রত্যেকের মোটিভ বিচার করতে করতে বড়মণির কাছে গিয়ে থমকে যাই। কে সেই ভূত, যে সকলের অগোচরে মৃতদেহ যেখানে পড়েছে, সেখানে ঘুরে বেড়ায়? কী তার উদ্দেশ্য? সে কি খুনি? নাকি প্রতিশোধ নিতে চায়? উদ্দেশ্য খুঁজতে গিয়ে রঙ্গমঞ্চে বড়মণির আবির্ভাব।"

"কিন্তু স্যার, বড়মণিকে গ্রেফতার করা গেল না।"

"এটাই ভাল হল দত্ত। উনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। সুস্থ থাকতে পারবেন কী করে? নিজের হাতে সন্তানকে মেরে ফেলেছেন! অজান্তে এত বড় ঘটনা ঘটিয়েছেন। ভাল থাকতে পারতেন? দীর্ঘদিন ধরে একটি হত্যার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ড্রসেরা গ্রুপের গাছকে পোকা খাওয়ানোটা ভাব! উনি প্রতিদিন মানসকে হত্যা করতেন ওভাবে! এত অন্যায় করেছেন জীবনে, আর নিতে পারলেন না অন্যায়ের ভার। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। কাউকে চিনতে পারছেন না। হয়তো চিকিৎসায় একদিন সাড়া দেবেন। আর নীলম, কতকাল ধরে অপেক্ষা করে ছিল প্রতিশোধের। সব শেষ হল এভাবেই!"

"হয়তো। স্যার, চা খাবেন?"

"দাও। খুব ক্লান্ত লাগছে দত্ত।"

মানসরঞ্জকে, নীলমকে, অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কঠোর শাস্তি পাওনা ওদের। এতগুলো বছর ধরে প্রতিশোধ স্পৃহা বুকে চেপে অভিনয় করে যাওয়া! সাঙ্ঘাতিক অপরাধী।

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কৃপাসিন্ধু। রোদ ঝকঝক করছে। অথচ মনের কোণে কত অন্ধকার লুকিয়ে রাখে মানুষ! সেখানে রোদের তাপ নেই। আছে সাপের শীতল নিষ্ঠুরতা। ওপর থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। আর তাই বড়মণি আমিষখেকো গাছদের পুষতেন মনের আরামের জন্য। অসম্ভব নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিলেন ভেতরে ভেতরে। প্রত্যেকবার পোকা খাওয়াতে খাওয়াতে মনে মনে স্বামীর খুনিকে মারছেন এই ভাবে, এটা ভাবতেন।

দত্ত এসেছে। ঘুরে দাঁড়াল কৃপাসিন্ধু।

(সমাপ্ত)

<u>গল্প</u>

ধ্রুবতারা

শবরী রায়

—লোকটার মৃত্যু মৃত্যু বাতিক হয়েছে দেখছি। মুখ ঝামটা দিয়ে জনান্তিকে বললো রুণা।

—বাতিক নয় রুণা। তুমি বুঝতে পারছ না, প্রায়ই বুকের বাঁ-দিকে চিনচিনে ব্যথা, কখনও ওই ব্যথাটা চোয়ালের দিকে, কখনও বাঁহাতে। ক'দিন আগেই দেখছিলাম গুগল সার্চ করতে করতে। হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এসব নানা সিম্পটমস।

—এই তো চেক আপ করানো হল। মাত্র পনের দিন আগে। ফুল বডি চেক আপ। সামান্য হাইপ্রেসার ছাড়া তেমন কিছু কি ধরা পড়েছে?

—রোজ আমার বুক ধড়ফড় করে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। পেচ্ছাপেরও একটু সমস্যা আছে মনে হচ্ছে। প্রস্টেট চেক করা হয় নি গতবার। কিডনিটাও খারাপ হল কিনা কে জানে, পা ঝুলিয়ে অফিসে এতক্ষণ অফিসে বসে থাকা, পা ফুলছে সন্ধের দিকে।

রুণা জানে এখন চলতেই থাকবে, তবুও মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, অফিসে মাঝে মাঝে একটু হাঁটাহাঁটি করলেই পারো। ওই তোমার সোনালি, রূপালি, পিয়ালিদের সঙ্গে গল্পটল্প চা কফি। জানে এতেই খানিক কাজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরে গেল, "সোনালি কী যে খেতে পারে, সকালে এসেই খাওয়া শুরু করে দেয়। এই শশা খাচ্ছে তো ওই লস্যি, তারপর স্ট্রবেরি, কিউই এসব দিয়ে স্যালাড, ওই তো চেহারা, সাজগোজের বাহারে যেন খুকিটি। বস তো আছেনই, নতুন এক্সিকিউটিভ-এর দিকেও নজর পড়েছে এখন। ভাবতে পারবে না তুমি, কীভাবে গলার স্বরই পালটে যায়।"

রুণা শাড়ির কুচি ঠিক করে। অল্প সানস্ক্রিন লাগিয়ে মুখে পাউডারের পাফ বোলায়। ছোট্ট একটা টিপ পরে। আয়নার দিকে তাকায় বাইরে যাওয়ার খাতিরে, নিজের চোখের দিকে আর তাকায় না। আজ মায়ের বাড়ি হয়ে যাবে। এঁচোড় রান্না করেছে। মায়ের বাড়ির গাছের এবছরের প্রথম এঁচোড়। যাওয়ার পথে দিয়ে যাবে। মা দুপুরে খাবে। খুব ভালবাসে মা। ভাবতেই মুখটা হাসি হাসি হল। কারোর মুখে একটুখানি হাসি দেখতে পেলেই ভাল লাগে রুণার। কত চেষ্টা করে রুণা আজকাল বাড়ির পরিবেশ আনন্দময় রাখার, অথচ অনুপমের মুখের হাসি কীভাবে যেন মিলিয়ে গেছে। অনুপম রীতিমত সফল, যে কেউ ওর ভাগ্যকে, পদকে পারিবারিক জীবনকে ঈর্ষার চোখে দেখে। কিন্তু অনুপম ভাবে ওর কিছুই করা হল না, শুধু শুধু সময় বরবাদ করেছে। এই কর্পোরেট জীবন ওর জন্য নয়। বরং ওর মৌলিক গবেষণার কাজ করতে হত। ছাত্র তৈরি করতে হত। অধঃপাতে যাওয়া যুব সমাজের জন্য ও কিছু করতে পারত। এই নিয়ে দুই ছেলে মেয়ের সঙ্গে লেগেই থাকে রাতদিন। ছেলে চুপচাপ। মেয়ে একটা কথাও ছেড়ে দেয় না। সারাদিন তর্কাতর্কি।

বেরোনোর মুখে রুণা অনুপমকে বলল আমি যাচ্ছি, মায়ের বাড়ি হয়ে যাব। আজ কি বাড়ি থেকেই কাজ করবে? না বেরোবে? আজ ভাত খেয়ো, এঁচোড় আছে। অনুপম মুখ তুলেও তাকাল না। ওষুধের বাক্স ঘাঁটছে। আর প্রশ্ন করে কথা বাড়াতে চাইল না রুণা। কাঁথাকাজের ব্যাগটা তুলল, ভেতরের পার্সে পয়সা আছে কিনা দেখল, তারপর চটি গলিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে এলেই একঝলক মুক্তির হাওয়া এসে ঝাপ্টা মারে মুখে। যদিও এই হাওয়া আজ অস্বস্তিকর, এমন ভ্যাপসা গরম। বাড়িতে এসি চলছিল। বন্ধ করেছে কিনা মনে করতে পারল না। কী আর হবে, অনুপম ঠিক বন্ধ করে দেবে, নবাব নন্দিনী গালি দিয়ে। হাসল রুণা। তার বাঁ গালে টোল পড়ে। সে ফর্সা, তাই তাকে সবাই সুন্দর বলে। সে নিজে জানে সে তেমন সুন্দরী নয়। বোকা বোকা গরুর মত চোখ তার, বরং ছোট বোন লুনা সুন্দরী। ডাকসাইটে যাকে বলে। গায়ের রঙ ওর যদিও জলপাই। আর প্রচণ্ড ডাকাবুকো বলতে যা বোঝায়। রুণা সে তুলনায় নিস্প্রভ। কিন্তু মানুষের বাঁধাগতের চিন্তার সাথে কে আর পারে! সবাই রুনাকেই সুন্দরী দেখে। চাঁদপানা। শান্ত। সেজন্যই তো অনুপমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। হিস্ট্রিতে তে এমএ করছিল তখন। আর অনুপম তখন আইআইটি পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করে এসেছে। লুনা, রুণা বছর দেড়েকের ছোট বড়। লুনাই হতে পারত অনুপমের যোগ্য সঙ্গিনী। যা হলে সবচাইতে ভাল হত তাই কি কখনও হয়? হয় না কিছুতেই। তাই আকাঙ্ক্ষা বলে একটা শব্দ ধ্রুবতারা হয়ে ঝলমল করে জীবনে। রুণা ভাবে তার আর কোনও আকাঙ্ক্ষার ধ্রুবতারা নেই। আহা পরের জন্ম যদি থাকত তাহলে সে একখানা সুরেলা গানের গলা চাইতো। কিম্বা খুব ভাল ছবি আঁকা। সব কিছুতেই সে মোটামুটি। কাজ চালিয়ে দিতে পারা গোছের। গানও জানে। কোন বাঙালি মেয়ে আর তাদের সময় গান শেখে নি। দু-একখানা গান কোরাসে গেয়ে দিতেও পারে। তার পরিবার নির্ঝঞ্ঝাট। ছেলেমেয়েরা ভালই মানুষ হয়েছে। অন্তত রুণার তা মনে হয়। অনুপমের কথা আলাদা। সে সবসময় খুঁত খুঁত করতেই থাকে। কোনওকিছুই তার মনঃপুত হয় না। একটা না একটা খোঁচা বের করবেই। তা নিয়ে পড়ে থাকবে অন্য আর একটা খোঁচা এসে না পড়া পর্যন্ত।

বাইরের গরম আর মুক্ত হাওয়ায় খুব ভাল লাগছিল রুণার। সূর্যের উত্তাপ তার খুব পছন্দের। মনে হয় কেউ যেন সঙ্গে আছে। মেঘলা দিন বড় অপছন্দের তার। অথচ অনুপম লুনা এমনকি মা'রও মেঘলা দিন পছন্দ। ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে হাঁটছিল সে। ওই যে তাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে এবার। লাল রঙ করা সবুজ বাগান ছাওয়া তাদের বাড়ি। ছোট থেকে ওই বাড়িতেই বড় হয়েছে। কতরকমের যে গাছ ওই সাড়ে চারকাঠা জমির ওপর। তিনখানা ঢ্যাঁড়স গাছ লাগিয়েছে মা, রোজ অন্তত ছ-সাতটা ঢ্যাঁড়স হয় খাওয়ার মত। গেলেই দিয়ে দেবে, দ্যাখ গাছের কী তাজা ঢ্যাঁড়স! বাজারে এমন পাবি? না না বাজারে এত তাজা মোটেই

পাওয়া যায় না। রোঁয়াগুলো দেখো, হাত বুলিয়ে সায় দেয় রুণা। খুশি হন সুজাতা। এখন তাঁর শখ বাগান করা। কিন্তু এই শখটাও তাঁর থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। দু'মাস পরে এখানে ফ্ল্যাট হবে। রুণা, লুনাও দুটো ফ্ল্যাট পাবে। মায়ের জন্য একটা। বাকিটা প্রোমোটারের। অবশ্য টাকাও দিয়েছে অ্যাডভান্স। যত দিন যাচ্ছে ততই গাছপালার প্রতি মায়ের যত্ন বেড়ে যাচ্ছে। এই করবী, ওই দোপাটি, বেড়ার মাধবীলতা, সাদা টগর, নীল অপরাজিতা, লাল থোকা জবা, বাবার লাগানো গন্ধরাজ, লিলি, জঙ্গলি গোলাপ, শিউলি কী নেই ওই সামান্য জায়গায়। দুটো ইউক্যালিপ্টাসও লাগিয়েছে পেছন দিকে।

শুধু আম গাছটাই বাকি তাই না মা? উত্তর দিলেন না সুজাতা। সত্যি রুণা কীসব অদ্ভুত কথা বলে ফেলে, বলার সময় একবারের জন্যও মনে পড়ল না বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। এইরকম মুখ ফসকে উল্টো পালটা কথা বেরিয়ে যায় বলেই না লোকে রুণাকে বোকা ভাবে। সুজাতা বললেন, অনুপম কেমন আছে? ওই যেমন থাকে, রুণা এড়িয়ে যেতে চাইল। লুনা বলছিল একবার সাইকোলজিস্ট-এর সাথে কনসাল্ট করার কথা। ওর কোন বন্ধু আছে। না না সাইকায়াট্রিস্ট নয়। ওর কাজের এত স্ট্রেস। সবাই তো সমান হয় না। খুব নরম মনের ছেলে অনুপম।

কোনও উত্তর না দিয়ে করবী গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল রুণা। মাকে বলল না রুণা যে আগামী সপ্তাহে সাইকায়াট্রিস্ট-এর সাথেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছে। লুনাকেও বলে নি। ছেলেমেয়েদেরও নয়। ওর বাতিক অসুস্থতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছেলেমেয়েরা। অনুপম নিজেও কম হচ্ছে না। সবসময় খিটমিট করলে চাকরিক্ষেত্রেও অসুবিধে হওয়ার কথা। হচ্ছেও। বুঝতে পারে রুণা। আর নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে ভাবে না। কোনদিনই বা রুণাকে সামান্য হলেও গুরুত্ব দিয়েছে অনুপম! স্কুলের চাকরিটা ওর খোলা হাওয়া। এখন সেখানেও নিত্য গোলমাল। আসলে দিনকালই বদলে গেছে। তোমাকে নিজেকেই বদলে নিতে হবে। চলতে পারলে চল, না পারলে অশান্তি ভোগ কর। কিম্বা ডুবে মর। যেমন অনুপম এখন ডুবন্ত। ওর সাহায্যের প্রয়োজন। মায়া হয় রুণার। আপনমনে হাসে রুণা। তার গালে সুন্দর টোল পড়ে। সংসার এমনই। যার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না সে-ই ভাবে অন্যের জন্য। স্বার্থপর দৈত্যের গল্প বলে রুণা নিজের ছাত্র ছাত্রীদের। নিজের ভেতরেও ঝালিয়ে নেয় সে। বড় প্রিয় গল্প তার।

বাইরের গেট খুলে ঢুকল রুণা, আঁচলটা গুঁজে নিল কোমরে। মাধবীলতার ঝাড় দুলে উঠল গেটের ওপর। একটা বড় নিশ্বাস ফেলল যেন। মাথা তুলে তাকাল রুণা। রঙ দেখল, গন্ধ পেল না তেমন। সন্ধেবেলায় গন্ধ গাঢ় হয়। এখন তো দুপুর। মাথাটা একটু ঘুরে উঠল? নাকি মৃদু ভূমিকম্প হল? প্রকৃতি যখন তখন প্রতিশোধ নিচ্ছে এখন। তারের ওপর বসে থাকা দুটো পায়রা একে একে উড়ে গেল। তার দুলছিল। মা এখন কানে কম শোনে। তবে কিছুতেই স্বীকার করে না। রুণার আসা টের পায় নি। কিন্তু হাবভাবে প্রকাশ করল না। জানত রুণা আসবে। অপেক্ষা ছিলই। লুনার জন্য অপেক্ষা নেই আর। দু'বছরে একবার আসে। একুশ দিনের মেয়াদ। সাতদিন মায়ের বাড়ি, বাকি কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ি। ওই সাতদিনের মধ্যেই দুই বোনের আড্ডা। দু'বছরের বেশি হয়ে গেছে আসে নি লুনা। মাথাটা কি ঘুরে গেল? নাকি আবার ভূমিকম্প!

মা ভূমিকম্প হল নাকি?

না তো। আমি টের পাইনি।

আজকাল ভূমিকম্প হলে কেউ আর শঙ্খ বাজায় না, তাই না মা? সুজাতা মাথা নাড়লেন। কে জানে বুঝলেন কিনা। হঠাৎ খুব ঘামছে রুণা। খুব গরম লাগছে তার। কাজের মেয়ে গোলাপি এল গেট খুলে।

কখন এলে তুমি বড়দি!

এই তো এলাম। তুই আজ এত দেরি করলি যে বড়। এই টিফিন বক্সটা রাখ। মাকে দিস দুপুরে, তুইও নিস একটু।

আচ্ছা। নিশ্চয়ই এঁচোড়। আহ তুমি যা রাঁধো

তুলি মাসি, কোথায় মা? মা কোথায়? তুলি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সাদা চাদরে ঢাকা ও কে? কে ও? চাদর সরিয়ে মুখের ঢাকা খুলে ফেলে ছেলেমেয়ে ডুকরে ওঠে মা, মা গো। ছেলে বলে, একটুও সময় দিলে না মা? এত তাড়া ছিল তোমার? তুলি বলে, মাসিমাকে এখনও বলা হয় নি। উনি রুণার খোঁজ করছেন। তোমরা কী বলবে ঠিক কর। ছেলে মায়ের দিকে স্থির তাকিয়ে, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

না। জিভে জল এসে যায়। জল টানার সুড়ুৎ শব্দ করল গোলাপি। মাথা ঘুরছে, গা গুলিয়ে উঠল রুণার। আমাকে একটু জল খাওয়াবি গোলাপি?

এই তো দিচ্ছি। তুমি ঘরে গিয়ে বসো না। কী ঘামছ! এত গরম লাগছে তোমার? মুখটা একেবারে লাল হয়ে গেছে। ফ্যান ছেড়ে বস একটু।

নারে, দেরি হয়ে যাবে স্কুলের। তুই জল দে দেখি। একটু আগে ভূমিকম্প হল নাকি রে গোলাপি?

না তো। আমি তো টের পাই নি।

রুণা ভাবছে হঠাৎ তার মাথা ঘুরছে, নাকি অনুপমের বাতিক ধরল!

মা ঘরে এসো না। এতক্ষণ বাইরে কী করছ! রোদ লেগে শরীর খারাপ হবে তোমার। কোনও কথা শোনো না তুমি আজকাল। কিছু হলে সেই তো আমাকেই ছুটতে হবে। মা... মাগো, বলে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল রুণা, সিঁড়ির দুধাপ নীচে। সেই ডাক শুনতে পেলেন না সুজাতা। গোলাপি কাচের গ্লাসে জল নিয়ে এসে দেখে বড়দি মাটিতে পড়ে আছে। কী হল দিদি! ও বড়দি গো! বলে এক চীৎকার। কাচের গ্লাস ভেঙে ঝনঝন শব্দ। চিৎকার আর গ্লাস ভাঙার শব্দে হঠাৎ ছুটে আসতে গিয়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে বেকায়দায় পড়ে গেলেন সুজাতা। ব্যথায় গোঙাতে লাগলেন তিনি।

গোলাপির চিৎকারে পাশের বাড়ি থেকে ছুটে এলেন মলয়বাবু আর তাঁর স্ত্রী তুলি। তুলি সুজাতার প্রতিবেশি। মাঝেমধ্যে রান্নার বাটি আদানপ্রদান হয়। রুণাকে তুলি বেশ পছন্দ করে। স্কুল থেকে ফেরার পথে মায়ের বাড়ি হয়ে এলে বিকেলের চায়ের আড্ডায় মাঝে মাঝেই তুলি হাজির হন। মলয় এসে সুজাতাকে পাঁজাকোলা করে তুলে আনলেন বারান্দায়। তুলি ঝুঁকে পড়লেন রুণার দিকে। মলয় ফোন বের করলেন পকেট থেকে।

অনুপম একটা সরবিট্রেট জিভের তলায় ফেলে কম্পিউটার খুলল। তারপর একের পর এক অফিসের ফোন আসতে লাগল তার। তিন চারটে ফোন নেওয়ার পর ভাবল আজ আর ফোন তুলবে না। ফোনটা সাইলেন্ট মোডে রেখে ঘুমোতে গেল সে। দেড়টায় ঘুম থেকে উঠে দেখল অন্তত পঁচিশটা কল। একটা রুণার কলও আছে। কলব্যাক করল অনুপম। নো আনসার। নবাব নন্দিনী। মুখ বাঁকিয়ে বললে সে। একটা আননোন নাম্বার থেকে অন্তত দশবার কল এসেছে। কোন মর্কট কে জানে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই নয়। নইলে কেউ উত্তর না পেয়ে এতবার ফোন করে? কলব্যাক করবে কিনা ভাবতে ভাবতেই আবার সেই নাম্বার বেজে উঠল। রাশভারি গলায় হেলো বলতেই এক মহিলা কণ্ঠ। দাদা আমি তুলি বলছি।

ওহ তুলি। এটা তোমার নাম্বার? আমি বুঝতেই পারি নি। কী ব্যাপার বলো। সব ঠিক আছে তো?

দাদা আপনি এক্ষুনি একবার দোলতলা মোড়ের হাসপাতালে চলে আসুন। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

কী দুর্ঘটনা? রুণার মায়ের কিছু হয়েছে? অনুপমের বুক আবার ধকধক শুরু করল। রুণাকে জানিয়েছ তো?

হ্যাঁ। রুণাও এখানেই আছে। আপনি এক্ষুনি আসুন।

রুণাকে ফোনটা দাও। ও তো ফোন ধরছে না। মায়ের আবার কী হল? ভালই তো ছিলেন সকালে। আমি ওঁর হাতে বানানো চা খেয়ে এলাম, মর্নিং ওয়াক করে ফেরার পথে।

রুণা এখন সামনে নেই। মাসিমার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে। ডান হাত। এখন প্লাস্টার হচ্ছে। আপনি আসুন।

এই হয়েছে জ্বালা। বুড়ো মানুষ সাবধানে থাকবে তা না। রাতদিন ফুলগাছ আর ফলের গাছ। ওই করতে গিয়েই এই বয়সে হাতটা ভাঙল। এখন ভোগো সবাই মিলে।

অনুপম হাসপাতালে পৌঁছে দেখলেন ছেলে আসছে পেছনে। মেয়ে যাচ্ছে আগে। তোরাও চলে এলি? কাজকর্ম ক্লাস ফেলে? কেউ অনুপমের দিকে তাকাল না ওরা। তুলি মাসি, কোথায় মা? মা কোথায়? তুলি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সাদা চাদরে ঢাকা ও কে? কে ও? চাদর সরিয়ে মুখের ঢাকা খুলে ফেলে ছেলেমেয়ে ডুকরে ওঠে মা, মা গো। ছেলে বলে, একটুও সময় দিলে না মা? এত তাড়া ছিল তোমার? তুলি বলে, মাসিমাকে এখনও বলা হয় নি। উনি রুণার খোঁজ করছেন। তোমরা কী বলবে ঠিক কর। ছেলে মায়ের দিকে স্থির তাকিয়ে, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। মেয়ে মাকে জাপটে ধরে আছে। দেহ ঠান্ডা। অনুপম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে টোলটা। একী! এখন হাসছে রুণা? অদ্ভুত তো!

মেয়েবেলা কি পিছু ছাড়ে কখনও?

ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

মেয়েবেলা যে জীবনের ঠিক কোন ক্ষণ থেকে শুরু হয় এটা কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারি নি আজও। এই প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েও তো নিজেকে ঠিক সেই মেয়েটিই মনে হয় যে আজও তার মেয়েবেলা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে যখন লেখবার ফরমান এল তখন বাধ্য হয়েই খুঁজতে লাগলাম সেই বিভাজন রেখা যা দিয়ে আমার সাংসারিক জীবনে প্রবেশের ঠিক আগে পর্যন্ত আমার স্বাধীন বিচরণের জগৎকে আমি আমার ‘মেয়েবেলা’ হিসেবে আলাদা করে ফেললাম।

যখন বুঝতে শিখেছি শৈশবে, তখন চারিদিকে তাকিয়েই দেখতাম পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা। শৈশব কালটা কেটেছে জলঢাকার ঝালং-এ। বাবা ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি করতেন। আমাদের নিজস্ব কোয়ার্টার পাহাড়ের কোলে। ফুলের বাগানে কত ফুল ফুটে থাকত। আমি যখন মাত্র পাঁচ বছরের, আমাকে নিয়ে যাওয়া হল ইস্কুলে ভর্তি করতে। ঝালং প্রাইমারি স্কুল। আমাকে লিখতে বলা হল খাতায়। আমি লিখব না কিছুতেই। লিখব না তো লিখবই না। শেষমেশ লিখলামই না। অতএব ভর্ত্তি হওয়াও হল না। কী মজা! নাচতে নাচতে বাড়ি চলে এলাম। পরের বছর আবার চেষ্টা। না সেবার অবশ্য বিগড়োইনি।

আমাদের ব্যারাকের ওপরেই রাস্তায় একটা টার্নিং দেখা যেত। একবার এক ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে গেলাম ওইটুকুনি বাচ্চা বয়সেই। আমি বারান্দায় বসে আছি। দেখলাম একটা ট্রাক ঐ টার্নিং দিয়ে ওপরে উঠছে। ওমা! উঠতে গিয়েই হুড়হুড় করে নেমে যেতে লাগল পেছেনে। অ্যাই অ্যাই করতে করতে দেখলাম হুড়মুড় করে ট্রাকটা পড়ে গেল এক্কেবারে খাদে। তার পর যা যা দেখেছি আর সেসব দৃশ্য ভাবতে ইচ্ছে করে না আজও। সার সার আট দশজনের মৃতদেহ আমার মনের ভেতরে এমন আতঙ্ক তৈরি করে দিয়েছিল যে বেশ অনেকদিন পর্যন্ত মায়ের আঁচল ছেড়ে নড়তে চাইতাম না আমি।

বাবাদের অফিসের গাড়ি, পরিবারকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে বরাদ্দ হত। আজ আমি বৈবাহিক সূত্রে যে মালবাজারে রয়ে গেলাম সেই মালবাজারেই আমি মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম বাবাদের অফিসের জীপে ‘সাধনা’ সিনেমা হলে ‘আপনজন’ সিনেমা দেখতে। তখন আমি ছ'বছরের মাত্র। সেদিন কি জানতাম, এই শহরই আমার জন্যে ফুলশয্যার রোশনাই জ্বেলে রেখেছে!

বাবার বদলির চাকরি। তৃতীয় শ্রেণীতে যখন পড়তাম তখন শুনলাম বাবা বদলি হয়ে গেছে দিনহাটাতে। এবার আমরা পৌঁছে গেলাম রাজার শহর কোচবিহারে। তৃতীয় শ্রেণীতেই ভর্তি হলাম রবীন্দ্রনগর প্রাইমারী স্কুলে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পড়াশুনো কোচবিহারের নিউটাউন গার্লস হাই স্কুলে। শুরু হল আমার মেয়েবেলার দ্বিতীয় পর্ব। নিউটাউন গার্লস এর মহামায়াদি, সবিতাদি

মীনাক্ষী ঘোষ

দেখলাম একটা ট্রাক ঐ টার্নিং দিয়ে ওপরে উঠছে। ওমা! উঠতে গিয়েই হুড়হুড় করে নেমে যেতে লাগল পেছেনে। অ্যাই অ্যাই করতে করতে দেখলাম হুড়মুড় করে ট্রাকটা পড়ে গেল এক্কেবারে খাদে। তার পর যা যা দেখেছি আর সেসব দৃশ্য ভাবতে ইচ্ছে করে না আজও। সার সার আট দশজনের মৃতদেহ আমার মনের ভেতরে এমন আতঙ্ক তৈরি করে দিয়েছিল যে বেশ অনেকদিন পর্যন্ত মায়ের আঁচল ছেড়ে নড়তে চাইতাম না আমি।

(তনাদি)-র কড়া শাসনে আমার পড়াশুনো শুরু। সেই সময়কার বান্ধবী রীণা, মিঠু, শ্রাবণী, বুলা, সুদীপা, ছন্দা, ইমলি সবাই মিলে অদ্ভুত আনন্দে আমরা সে সময়টা কাটিয়েছি। ছন্দা ও আমি এক পাড়াতে একদিন এক ছুটির দুপুরে আমরা চুপিচুপি বাড়ির থেকে বেরিয়ে বাড়ির পাশের কুল গাছের নিচে চলে গেছি দু'জনে মিলে। বসে কুল মাখা খাচ্ছি আরামসে। দু'জনের মায়েরই ছিল বড্ড কড়া শাসন। প্রায় বন্দী হয়ে থাকতে হত ছুটির দিন দুপুরবেলাগুলোতে। অপেক্ষা করে বসে থাকতাম কখন বিকেল হবে। জানি যে অসুস্থ হয়ে পড়ব! ব্যস, শরীর এমন বেগড়বাই করল যে, তারপর থেকে আরো বেশি কড়া নজরে রাখা শুরু হল আমাদের। কী আর করব, সেদিন থেকে দুই বান্ধবী জানালা দিয়ে ইশারায় কথা বলতাম বেশ কিছুদিন। আজও ওই সব স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে চলে এলে একা একাই হেসে উঠি।

বাড়ি ভাড়া করে থাকার কারণে তিন বার বাড়ি বদল করতে হয়েছিল। শেষ যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম তা ছিল কোচবিহারের নিউটাউনে নবীন সিং-এর বাড়ি। তিনি নাকি রাজবাড়ির কর্মচারি ছিলেন। সেই বাড়ির দেওয়ালে রাজবাড়ির রাজাদের প্রচুর ছবি ছিল। সেই দেওয়ালের ছবিগুলো দেখে নিজের মনে রাজবাড়ির অন্দরমহলের কল্পনা করে নিতাম। বাড়িটার সামনে ছিল বিশাল মাঠ। এখন অবশ্য সে মাঠ আর নেই। টুকরো টুকরো করে বিক্রি হয়ে বহুতল বিল্ডিং হয়ে গেছে সেখানে। মনটা বিষন্ন হয়েছিল বলাই বাহুল্য।

একটা স্মৃতি খুব মনে পড়ে, নিউটাউন গার্লসের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় ‘মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে’ গানের সঙ্গে ড্রিল। কী আনন্দেই যে তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম! রাসমেলা এলেই খুব মজা পেতাম সার্কাস দেখতে। এইট পর্যন্ত কোচবিহারে কাটিয়ে জলপাইগুড়ি চলে এলাম সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে। একটা ঘটনা আজও ভুলতে পারি নি। নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তিনদিনের মাথায় বাবা আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বলে দিলেন, “তুমি একা একাই বাড়ি ফিরে এসো”। এমনিতেই নতুন স্কুল, নতুন ক্লাস, সেই সঙ্গে জলপাইগুড়ির নতুন পরিবেশ সবটা মিলে একটা টেনশন তো ছিলই, তার ওপর আবার একলা ফেরার চিন্তা। আমরা থাকতাম রায়কত পাড়ায় অজিত বক্সির বাড়িতে ভাড়া। সেন্ট্রাল গার্লস থেকে দিনবাজারের ব্রিজ পর্যন্ত তো ফিরেছি, তারপর? ব্যস, রাস্তা গেছে হারিয়ে। এমন গোলমাল হয়েছে যে ভুলেই গেলাম কোন দিক দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছিল। পাছে আমাকে একলা পেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ একা একাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম তারপর বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পিচ রাস্তায় উঠে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উফ্, কী ভয় যে পেয়েছিলাম সেবার!

মাধ্যমিক পাশ করেই চলে গেলাম কমার্স কলেজে। কলেজে দু'বেণী ঝুলিয়ে একটা ডায়রি আর পেন নিয়ে যাওয়ার সে এক অন্যরকম আনন্দ, আজও অনুভব করি সেই দিনগুলো। জলপাইগুড়ি মানেই রূপশ্রী, রূপমায়া আর দীপ্তি সিনেমা হল, জুবিলি পার্ক, তিস্তা নদীর বাঁধ, যোগমায়া কালিবাড়ি। আমার মেয়েবেলার বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে জলপাইগুড়িতেও। সেইসব স্মৃতিকে বস্তা-বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে, মেয়েবেলার জীবনে ইতি টেনে একদিন পৌঁছে গেলাম বিবাহিত জীবনে, ডুয়ার্সের মাল শহরে, শুরু হল নতুন জীবন।

ওই যে শুরুতেই বললাম না, মেয়েবেলা পিছু ছাড়ে নি আজও। এখনও স্কুলের কিংবা কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে ভুলেই যাই বিবাহিত জীবন মানে মেয়েবেলার মৃত্যু। আমার মতে, ছেলেবেলাই হোক কিংবা মেয়েবেলাই জীবনের সেরা সময় ঐ ছোটবেলাটাই।

পুরাণের নারী

সুভদ্রা মহাকাব্যের বঞ্চিত নায়িকা

শাঁওলি দে

সু বিশাল মহাভারতের চরিত্র আর ঘটনার শেষ নেই কোনো। বড় বড় চরিত্রের ভিড়ে তাই অনেক সময়ই ঢাকা পড়ে যায় ছোটখাট অসংখ্য চরিত্র। দ্রৌপদীর চরিত্রের নানা দিক নানা গবেষক নানা ভাবে তুলে ধরেছেন অনেক সময়ই, আবার পাঠক মহলে দ্রৌপদীর মতো কুন্তি, গান্ধারীও খুব জনপ্রিয় সব চরিত্র। এমন সব নামের আড়ালে তাই নিঃশব্দে পড়ে থাকে মাদ্রী অথবা সুভদ্রাও।

মহাভারতের নানা কাহিনীর মত পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদীর সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন সর্বজনবিদিত। বিয়ের পর পাঁচ স্বামীর মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে যাতে বিরোধ না বাধে সেজন্য দেবঋষি নারদের পরামর্শে তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে এক বছর কাল ধরে এক এক ভাই দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাস করবেন। সেইসময় কালে অন্য ভাই সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে থাকার সময় অর্জুন অস্ত্র আনার জন্য প্রবেশ করলে নিয়ম ভঙ্গ হয়। এরপর নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে অর্জুনকে বারো বছরের জন্য বনে চলে যেতে হয়েছিল। এই সময়ই কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের দেখা হয়।

কৃষ্ণ আর অর্জুনের সম্পর্কের সবদিকে আলো ফেললে, সে আলোচনা কোনোদিন শেষ হবে না। এই অদ্ভুত সম্পর্কের ফাঁকেই আরও এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নিঃশব্দে। তা হল কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় বোন সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের প্রেম। প্রথম দেখাতেই সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন অর্জুন। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন তাঁর সখার মনের ভাব। অর্জুন যখন জানতে পারলেন সুভদ্রা কৃষ্ণেরই বোন, তিনি তাঁকে পাওয়ার উপায় জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন,

প্রসহ্য হরণঞ্চাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
বিবাহহেতুঃ শূরাণামিতি ধর্মবিদৌ বিদুঃ।।

অর্থাৎ, বীর ক্ষত্রিয়দের বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করাও সঙ্গত। অর্জুন একথা শুনে বুঝলেন কৃষ্ণের এই বিবাহে মত আছে, তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের মত জেনে স্থির করলেন হরণ করতে হবে সুভদ্রাকে। এরপর অর্জুন মৃগয়ায় বের হওয়ার অছিলায় সুভদ্রাকে হরণ করতে প্রস্তুত হলেন। সুভদ্রা ওই সময় পূজা শেষ করে দ্বারকার দিকে যাচ্ছিলেন। অর্জুন মাঝ রাস্তায় তাঁকে সবলে নিজের রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হলেন।

সুভদ্রাকে এভাবে জোর করতে দেখে রক্ষীদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। এই খবর শোনামাত্র ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধবংশীয় রাজারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এসব দেখে বলরাম বাধা দিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণ এ বিষয়ে যখন এতটা চুপ করে আছেন, তখন অন্য কারো ক্ষুব্ধ হওয়া সাজে? এরপর বলরামই কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি মেনে নিলেন অর্জুনের এই অন্যায়? বলরাম কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন কৃষ্ণকে। অর্জুনের উদ্দেশে বললেন, 'ন চ সোহ ইতি তাং পূজাং দুবুর্দ্ধিঃ কূলপাংসনঃ' অর্থাৎ অর্জুন কুলাঙ্গার, সে পূজার যোগ্য নয়। কৃষ্ণ নানাভাবে বলরামকে বোঝালে অবশেষে তিনি শান্ত হন। অর্জুন সুভদ্রা দ্বারকায় ফিরে এলে সেখানে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কাশীদাস আবার অন্য কথা লিখলেন। অন্যভাবে দেখালেন অর্জুন সুভদ্রার মিলন। অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হলে সুভদ্রা সত্যভামার কাছে সব কথা বললেন। কিন্তু সত্যভামা তাঁকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিরষ্কার করে বললেন, যে সুভদ্রার পিতা বসুদেব, ভাই স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর কি অন্য পুরুষে মন দেওয়া সাজে? সুভদ্রা তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলা সকল/ কিন্তু সে পুরুষ বিনা জীবন বিফল'। এই কথা থেকেই অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার গভীর প্রেম প্রকাশ পায়। এরপরই সুভদ্রা গভীর রাতে অর্জুনের সঙ্গে অভিসারে গেলে সেখানেই গন্ধর্ব মতে দুজনের বিয়ে হয়। সত্যভামার কাছে কৃষ্ণ এই বিয়ের কথা জানতে পেরে বলরাম বলেন, তিনি কখনোই মেনে নেবে না এই বিয়ে। তবু পরদিন সকালে কৃষ্ণ স্বয়ং বলরামের কাছে গিয়ে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ের প্রস্তাব রাখেন। রাজি হন না বলরাম, উলটে 'কৌরবকুলের শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন'কে দূত পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করেন। এই কথা শুনেই যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণের সাহায্যে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে হস্তিনাপুরে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে দুর্যোধন আমন্ত্রণ পেয়ে সুভদ্রাকে বিয়ে করার জন্য রওনা হন এবং যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণলিপি পাঠান। যুধিষ্ঠির নিজে না গিয়ে ভীমকে সসৈন্যে পাঠালেন। ভীম দুর্যোধনকে বরবেশে দেখে একটু ঘুরিয়ে জানালেন সুভদ্রা ও অর্জুনের বিয়ের কথা। এদিকে দ্বারকায় অর্জুন সুভদ্রাকে বিয়ে করেছেন জানতে পেরে বলরাম অর্জুনকে তিরষ্কার করে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। এরপরই সুভদ্রার চরিত্রের এক অন্যদিক ফুটে ওঠে পাঠকের সামনে।

সারথি অর্জুনের রথ চালাতে অস্বীকার করলে সুভদ্রা তখন এগিয়ে আসে, বলে ওঠে, 'ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে/ আজ্ঞা কর আমায় চালাই অশ্বগণে।।' এখানে সুভদ্রা শুধু আর প্রেমিকা থাকে না, হয়ে ওঠে চরম বিপদে থাকা স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী। বিপদে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে, স্বামীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বীরত্বের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ধৈর্যহারা হন নি তিনি, শক্ত হাতে নিজেই ধরেছেন হাল। নিপুণতার সঙ্গে রথ চালিয়ে অর্জুনকে তিনি যেমন সাহায্য করেছেন, তেমনি দৌপদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে সরল করে তোলার ব্যাপারেও তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই পাই আমরা।

বারো বছর পূর্ণ হলে অর্জুন সুভদ্রাকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে গেলে দ্রৌপদী অভিমানে অর্জুনকে বলেছিলেন সুভদ্রার কাছেই যেতে। অর্জুন তখন গোপবধূর বেশে সুভদ্রাকে কুন্তী ও দ্রৌপদীর কাছে পাঠালে তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীকে বললেন, 'আমি তোমার দাসী।' সেই থেকে দ্রৌপদীর প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠলেন সুভদ্রা।

সুভদ্রার কথা আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ও পাওয়া যায়। বীরপুত্র অভিমন্যুর মা হিসেবেও তিনি রত্নগর্ভা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার সঙ্গে পাণ্ডবদের শিবিরে থাকছিলেন। অভিমন্যু নিহত হলে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন উত্তরা ও সুভদ্রাকে স্বান্তনা দিতে। কৃষ্ণ বলেছিলেন, সুভদ্রা যেন পুত্রশোক না করে, কারণ তাঁর পুত্র বীর, বীরের মত তাঁর মৃত্যু। সুভদ্রার পুত্র পরমগতি লাভ করেছে। পুত্রশোকে কাতর হয়ে বারবার মুর্ছালাভ করছিলেন সুভদ্রা। উত্তরাকেও সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা ছিল না তাঁর।

সুভদ্রার চরিত্রের কিছু দিক ওঁকে কখনোই দ্রৌপদীকে অতিক্রান্ত করতে দেয় নি বা বলা যেতে পারে মহাকাব্যে উপেক্ষিতাই থেকে গেছেন তিনি। প্রথমত সুভদ্রা কখনোই স্বামীর সঙ্গে অনুগমন করেন নি অথচ দ্রৌপদী তা করেন এবং নানা লাঞ্ছনা সহ্য করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়, কিম্বা যুদ্ধের আগে দ্রৌপদীকে নানাভাবে পাণ্ডবদের উত্তেজিত করতে দেখা যায়। কিন্তু এইসব সময় সুভদ্রা ছিলেন নীরব। শ্রীকৃষ্ণের বোন ও বীরপুত্র অভিমন্যুর মা হিসেবে কিছুই কি বলার ছিল না ওঁর? অথচ কুরুক্ষেত্রের এক বীভৎস রূপ দেখে যখন ছেলে কেঁপে উঠেছিল ভয়ে, তখন এই সুভদ্রাই কত সরলভাবে বুঝিয়ে ছিলেন যুদ্ধ আসলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

কোনও কোনও গবেষক এইজন্যই হয়ত বলেন, সুভদ্রার চরিত্র আরও আড়ালে চলে যেত, বা পাঠক ভুলেই যেত যদি অভিমন্যুর মৃত্যু না হত! ব্যাসদেব হয়ত নির্দিষ্ট কিছু কারণের জন্যই এই চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আজীবন বঞ্চিতই করে রাখলেন।

সম্পূর্ণ মহাকাব্য জুড়ে সুভদ্রা তাই হয়ে রইলেন অর্জুনের প্রেয়সী পত্নী, অভিমন্যুর শোকাতুরা মা। বীরাঙ্গনা তেজস্বী হওয়া সত্ত্বেও সুভদ্রা রইলেন নিঃপ্রভ, বঞ্চিতা।

একটি ম্যাজিক রিয়ালিস্টিক অণু নাটক

(স্থান বিশ্বামিত্রের আশ্রম। কাল কলি।)

আশ্রমিক: (পাঠ) কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভ'রে—।

মুনি: এই! এটা কার লেখা জানিস?

আশ্রমিক: বিদ্যাসাগর।

মুনি: চাঁটিয়ে গাল চৌকো করে দেব!

আশ্রমিক: কাল তো বটতলার সভায় নেতা তাই বললেন। আপনি কি নেতার চাইতে বেশি জানেন?

(হন্তদন্ত হয়ে আরেক আশ্রমিকের প্রবেশ)

মুনি: কী রে? হাঁফাচ্ছিস কেন?

আশ্রমিক ২: খুব খারাপ খবর। আশ্রমের ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মুনি: কার এত বড় আস্পর্দা?

আশ্রমিক: আস্পর্দা মানে? জনগণের টাকায় আশ্রমে লেখাপড়া শেখান হল লস্ আইটেম! সেই টাকায় রাজার দুটো দেশ ঘোরার খর্চা উঠে যায়।

মুনি: (দ্বিতীয় আশ্রমিককে) এটাকে ধরে দু-ঘা লাগা তো!

আশ্রমিক ২: কী হবে দিন রাত্রে জল ঢেলে ফুটো পাত্রে? ও হল ভক্ত।

আশ্রমিক: ও! আমাকে ভক্ত বলা হচ্ছে! তোমাদের মোবাইল রিচার্জের মুদ্রা থাকে, বিরিয়ানি খাওয়ার মুদ্রা থাকে, সোমরস কিনে খেতে পার— আশ্রমের জন্য মুদ্রা দিতেই তোমাদের যত আপত্তি!

মুনি: হ্যাঁ রে? রাজকোষ কি বাড়ন্ত? আশ্রমের ভর্তুকি তুলে দিচ্ছে— রামরাজ্যে তো এ সব ছিল না?

আশ্রমিক ২: পণ্ডিতরা তো তাই বলছে।

আশ্রমিক: হুঁঃ! পণ্ডিত! নোবেল পেলেই বুঝি পণ্ডিত হয়ে যায়! ভিনদেশে গিয়ে দুটো বিয়ে করলে আমিও নোবেল পেতাম। রাজা তো বলেই দিয়েছেন আগামি ভাদ্রের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার মধ্যে অর্থনীতি পনের অক্ষৌহীনিতে চলে যাবে।

মুনি: তা হলে ব্যাটা রাজন্ আশ্রমের ভর্তুকি কমাচ্ছে কেন?

আশ্রমিক ২: পণ্ডিতরা বলছে সব বাজে কথা। দেশের মুদ্রা বাড়ন্ত। মুদ্রা বাতিলকরণ চূড়ান্ত ফ্লপ।

(আশ্রম বিদ্যার্থি পরিষদের সভাপতির প্রবেশ)

সভাপতি: আশ্রমে থাকা খাওয়ার খরচ ছয় গুণ বাড়ছে। রাজনের এই অপূর্ব সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়ান।

মুনি: আশ্রমে পড়তে তো তবে অনেক খরচা হবে বৎস্য!

সভাপতি: হবে। সবই তো বেদে আছে। সরকার বেদ ছাপিয়ে ঘরে ঘরে বিলি করবে। আধার কার্ড থাকলেই পেয়ে যাবে বেদ। সেটা পড়লেই যথেষ্ট। এরপরেও যার শখে আশ্রমে আসবে তাঁরা মুদ্রা খর্চা করে আসবে!

মুনি: সব বেদে আছে?

সভাপতি: এই দেখুন, ফেসবুকের পোস্ট! হোয়াটসঅ্যাপ দেখবেন?

আশ্রমিক ২: সবই ফেসবুকে আছে নাকি?

আশ্রমিক: না। সব বেদে আছে।

আশ্রমিক ২: সেটা জানব কী ভাবে? বেদ থেকে না ফেসবুক থেকে?

সভাপতি: ফালতু তর্ক করছেন কেন? বেদে আছে বলেই ফেসবুকে আছে। চাইলে টুইটারও দেখিয়ে দিচ্ছি। নগর কোটালের ছেলে টুইট করেছেন। দেখবেন?

(দুর্বাসার প্রবেশ)

দুর্বাসা: (উত্তেজিত) হ্যাঁ রে বিশে! গরুর দুধে নাকি মণিমাণিক্য থাকে? ওরা সব বলাবলি করছিল!

মুনি: আপনি এ সবে বিশ্বাস করেন?

আশ্রমিক: আপনার বিশ্বাসে কী যায় আসে?

দুর্বাসা: অরে পামর! দেব এক শাপে মুন্ড উড়িয়ে!

সভাপতি: দেখুন স্যার! আপনি মানী লোক। বিখ্যাত মুনি। অনুরোধ করছি তর্জনি নামিয়ে কথা বলুন! এই জন্যই আমরা আশ্রমে লেখাপড়ার খরচ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে চাই। আপনারা জানতে জানতে মানতে ভুলে গেছেন। কিছুই আর বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে চান না।

দুর্বাসা: ছোকরা কয় কী?

মুনি: রাজা নাকি আশ্রমের ভর্তুকি আর টানতে পারছেন না।

দুর্বাসা: হবে না? বণিকদের কাছ থেকে যে হারে মুদ্রা নিয়েছে তার ফলটা ভোগ করতে হবে না!?

আশ্রমিক: দেখলে দাদা! এদের আশ্রম চালাবার অনুমতি দেওয়াটাই উচিত হয় নি।

আশ্রমিক ২: কী বলছেন আপনি? ইনি স্বয়ং দুর্বাসা!

সভাপতি: উনি রাজদ্রোহী! ওনাদের উচিত সিন্ধুপ্রদেশে গিয়ে থাকা!

দুর্বাসা: (ফিসফিসিয়ে) হ্যাঁ রে বিশে! এ কি ভক্ত?

মুনি: (ওই) হ্যাঁ। আপনি গোদুগ্ধের ব্যাপারটা কোথায় শুনলেন?

দুর্বাসা: এ নিয়ে তো জোর জল্পনা চলছে। রাখালেরা এখন সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে গরু চরাতে যাচ্ছে।

সভাপতি: ঠিক আছে। তবে ওই কথাই রইল। (আশ্রমিককে) তুই রাজার সমর্থনে তাড়াতাড়ি একটা পদযাত্রা বের কর। সঙ্গে ইট নিবি। (প্রস্থান)

আশ্রমিক: আজ কি আর পাঠ হবে?

মুনি: যতটুকু হয়েছে ততটুকু মনে রেখ। যে শ্লোকটি পড়ছিলে তাঁর রচয়িতার নাম সহপাঠির কাছ থেকে জেনে নাও। কাল জিগ্যেস করব।

আশ্রমিক: নেতা তো বলেই দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। আসছি। (প্রস্থান)

মুনি: দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে যান। ভাবুন হে দুর্বাসা! রবিবাবুর শ্লোক বিদ্যেসাগরের নামে চলছে আজকাল।

দুর্বাসা: তা-ও তো চলছে! দিনেমানে দেখবি লোকজন বলছে শ্লোকটা বেদে আছে। এখন গল্পের যুগ। বার্তাবাহকেরাও গল্প শোনাচ্ছে। যে কাজ হয় নি সে কাজেরও গল্প চলছে। এই জন্যই আমি আজকাল তাড়াতাড়ি ক্রোধ সংবরণ করে ফেলি।

মুনি: ঠিক। গল্পের গরু গাছে উঠত এখন স্বর্ণপ্রসবিনী হয়েছে। (দীর্ঘশ্বাস) কী আর করা! চলুন ছায়ায় বসে সোমরস পান করি।

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বইপত্র

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

আগামী ২রা জানুয়ারি, ২০২০ মুর্শিদাবাদ বই মেলায়
প্রকাশিত হবে
মুর্শিদাবাদ
জাহির রায়হান

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র **www. dooarsbooks.com**

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে

সুজিত দাস

কাউকে খুন করতে হলে দানা কিংবা ইস্পাত কোনোটারই দরকার নেই। শুধু তার জীবন থেকে দ্রিমি দ্রিমি কেড়ে নাও, জনারণ্যে নির্বাসন দাও। সকলকে বলে দাও ওই মানুষটা আসলে রাস্তা কাটা এক কালো বেড়াল। মফস্‌সল থেকে কলকাতার দূরত্ব কয়েক আলোকবর্ষ। এন জে পি থেকে শেয়ালদা একটি নির্ঘুম রাত। আই এক্স বি থেকে সি সি ইউ মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। তবু কোথায় যে কীভাবে খুনের নীল নকশা তৈরি হয়, তা কেউ জানে না। এ এক চিরকালীন অথবা সমকালীন প্রেক্ষাপট, যেখানে পাতা নড়ে ওঠার আগেও অনুমতি নিতে হয়, চুম্বনের প্রাক্‌মুহূর্তে জারি হতে পারে সমন। অরগ্যাজমের মাহেন্দ্রক্ষণে কর্কশ ডেকে উঠবে গামার বৃক্ষের রাতচরা পাখিটি। ঘুম ভেঙে এক পবিত্র সকালে তুমি আবিষ্কার করতে পারো তোমার নামেই শ্যুট অ্যাট সাইট অর্ডার।

বন্ধ চাবাগান থেকে জে ডব্লু ম্যারিয়ট, খিদে এবং যৌনতার একটাই ভাষা। মাদল থেকে বেস গিটার, হাঁড়িয়া থেকে স্কচ... সুর এবং নেশা এই উপন্যাসে পাঠককে মেঘের নবম তলে নিয়ে যাবে। উপন্যাসের শুরু এক ফায়ারিং রেঞ্জে, যেখানে এক তরুণ অফিসার জীবনে প্রথমবার পয়েন্ট থ্রি এইট ওয়েবলি স্কট রিভলবার ছুঁয়ে দেখে। গানপাউডার থেকে শুরু এই কাহিনি উন্মোচিত হতে হতে বিভিন্ন প্রবাহে চু-কিত-কিত খেলতে থাকে গ্রাম ও শহরে। অশ্রু, এবং কান্নায়। প্রেমে ও পলাশে। কবিতার অলিন্দ থেকে গদ্যের নিশিনিলয়ে। এই ডার্ক রূপকথায়, বরাবরের মতই, শেষ ধ্রুবক একজন নিঃসঙ্গ মানুষ।

জানুয়ারি, ২০২০ থেকে মাসিক "এখন ডুয়ার্স" পত্রিকায় শুরু হতে চলেছে **সুজিত দাস**-এর ধারাবাহিক উপন্যাস **"ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট"**।

ফিঙ্গার্স ক্রসড।

'ন্যাফ' আয়োজিত নেচার ক্যাম্পে বাড়ির শিশুটিকে পাঠান

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন Himalaya Nature & Adventure Foundation। সংক্ষিপ্ত 'ন্যাফ' নামেই যার বেশি পরিচিতি। যার নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে রোমাঞ্চকর পাহাড় জঙ্গ ডিঙানো প্রকৃতির হাতছানি, দুঃসাহসিক কাজের প্রয়াস ও অভিযান। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি পরিবেশের সংরক্ষণ, দূষণ প্রতিরোধ, ছোট থেকে নিয়ে বড়দের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃতিপাঠ শিবির ইত্যাদি এই সংগঠনের সারা বছরের কর্মসূচির তালিকার অঙ্গ। এর মধ্যে অন্যতম ছোটদের নিয়ে আমাদের বাৎসরিক প্রকৃতিপাঠের শিবির। শীতের আমেজ গায়ে মেখে প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ে এই শিবিরের আয়োজন হয়ে থাকে পাহাড় জঙ্গল ঘেরা তরাই ডুয়ার্সের কোনও না কোনও অঞ্চলে।

এই বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। সংগঠনের উদ্যোগে এবার কালিম্পং জেলার অন্তর্গত শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ৫৮কিমি দূরে ওদলাবাড়ির পথ ধরে সবুজে ঘেরা তুরিবাড়ি ও পাথরঝোড়া চা বাগান পেরিয়ে নোয়াম বনবস্তি লাগোয়া ময়দানে আমাদের এবারের শিবিরের আয়োজন। ১৮ থেকে ২৩শে ডিসেম্বর সর্বভারতীয় স্তরের বিশেষভাবে সক্ষম শিশু, কিশোরকিশোরীদের জন্য প্রকৃতিপাঠের আসর দিয়ে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, এ বছর তার ২৯তম বর্ষ। শিবিরের দ্বিতীয় ভাগ ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর রয়েছে সাধারণ বাচ্চাদের জন্য ৩৫তম বর্ষের প্রকৃতিপাঠের আসর। মূলত বড়দিনের ছুটিকে সামনে রেখে সাধারণ স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের আমাদের এই শিবিরে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এই আগাম বার্তা। গাছপালা, ফুল,পাখি, কীটপতঙ্গ চেনার পাশাপাশি রয়েছে ট্রেকিং, অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেবার কৌশল আয়ত্তকরার সুযোগ যা ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু, কিশোর-কিশোরীদের প্রকৃতিমুখী করে তোলার পাশাপাশি তাদের প্রতিভা বিকাশের এক অনন্য সুযোগ। 'এখন ডুয়ার্স' এর পাঠক পাঠিকাদের কাছে আবেদন— আমার আপনার বাচ্চাদের একঘেয়ে গতে বাঁধা স্কুলজীবন, বইয়ের ভার ও অবসরের বিনোদনের সম্বল মাত্র মোবাইলের ভিডিও গেম; এগুলি থেকে দূরে সরিয়ে এই পাঁচটি দিন বড়দিনের উপহার হিসেবে ওদের জীবনে জুড়ে দেই।

ন্যাফের এই প্রকৃতিপাঠ শিবির সম্পর্কে বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন নিম্নে উল্লেখিত আমাদের অফিসের ঠিকানায়।

Himalayan Nature & Adventure Foundation. Saibal Mansion– 16 H.C Road. Siliguri-1, Ph no- 0353-2434100 Email- hnafsiliguri@gmail.com

নিজস্ব প্রতিবেদন

WEL COME

HOTEL YUBRAJ & RESTAURANT MONARCH

CHARU ARCADE | B. S. ROAD | COOCHBEHAR

CONTACT NO.

+91 9735526252, (03582) 227885

Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com

www.hotelyubrajcoochbehar.com

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.